**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

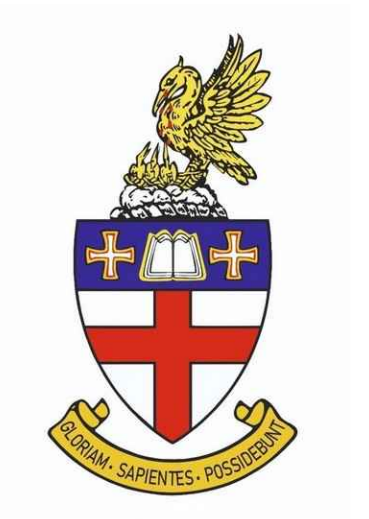

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

দিগ্‌দর্শন

ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরীর ভারতবর্ষে আগমনের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে

॥ বিশেষ সংকলন ॥

উইলিয়াম কেরী স্টাডি এণ্ড রিসার্চ সেন্টার
১৪/২, সদর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

উইলিয়াম কেরীর জীবনীপঞ্জী

১৭৬১—১৭-ই আগস্ট ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্প্‌টন্‌শায়ার প্রদেশের টাউসেস্টার কাউণ্টির অধীন পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়াম কেরীর জন্ম।

১৭৭৩—দারিদ্রের কারণে স্কুল পরিত্যাগ ও কৃষিকাজের শিক্ষানবিশী।

১৭৭৫—শারিরীক অসুস্থতার কারণে কৃষিকাজ ছেড়ে হ্যাক্‌ল্‌টনে জুতো তৈরীর শিক্ষানবিশী।

১৭৮১—১০-ই জুন ডরোথি প্ল্যাকার্ডের সঙ্গে কেরীর বিবাহ।

১৭৮৫—কেরী হ্যাক্‌ল্‌টন ছেড়ে মৌল্‌টনে চলে আসেন।

১৭৮৬—প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ শুরু।

১৭৮৯—লেষ্টার শহর থেকে কিছু দূরে হার্ভে লেনে ধর্মযাজক বৃত্তি গ্রহণ

১৭৯২—"An Enquiry" নামক পুস্তিকার প্রকাশ।

১৭৯৩—১৩-ই জুন "ক্রন প্রিন্সেসা মারিয়া" নামে একটি দিনেমার জাহাজে কেরীর সপরিবারে স্বদেশ ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করে ভারতযাত্রা।

১৭৯৩—১১-ই নভেম্বর কেরীর জাহাজ কলকাতায় পেঁছায়।

১৭৯৪—১৫-ই জুন মালদা জেলার মদনাবাটিতে নীলকুঠির ম্যানেজার পদে যোগদান। দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন।

১৭৯৬—অক্টোবর মাসে জন্‌ ফাউণ্টেন ইংল্যাণ্ড থেকে মদনবাটীতে কেরীকে সাহায্য করতে আসেন।

১৭৯৯—মদনাবাটীর নীলকুঠী বন্ধ ও কেরীর কর্মচ্যুতি। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক ইংল্যাণ্ড থেকে একদল মিশনারীকে (জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, উইলিয়াম্‌ গ্রাণ্ট ও তাদের পরিবার) ভারতে প্রেরণ। কেরীর সপরিবারে মদনাবাটী ত্যাগ।

১৮০০—কেরীর সপরিবারে শ্রীরামপুরে আগমন। শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় বাইবেল (ম্যাথুর সুসমাচার অংশ) মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ। শ্রীরামপুরে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা।

দিগদর্শন

দশম সংকলন

নভেম্বর, ১৯৯২

ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরীর
ভারতবর্ষে আগমনের
দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা

মলয় দেওয়ানজী
সরল চট্টোপাধ্যায়

উইলিয়াম কেরী স্টাডি এ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার
১৪/২, সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

প্রকাশক ঃ
উইলিয়াম কেরী স্টাডি এণ্ড রিসার্চ সেণ্টার-র পক্ষে
রেভাঃ দীনেশ চন্দ্র মণ্ডল
১৪/২, সদর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক ঃ
প্রিণ্টার্স কর্ণার প্রাইভেট লিমিটেড
১, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ ঃ ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী ও মুন্সী রামরাম বসু

ফটো ঃ এডুইন অসীম কুমার বালা

দাম ঃ দশ টাকা

সূচীপত্র ঃ

	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৮
উইলিয়াম কেরী ও সংস্কৃতিচর্চা / ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত	১
জাগরণের ধারায় কলকাতার কয়েকটি সংস্কৃতি পীঠ ঃ	
সেকাল একাল / ডঃ শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী	১১
বাংলা সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শক উইলিয়াম কেরী / বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়	১৮
ডঃ উইলিয়াম কেরী ঃ একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব / সঞ্জীব সরকার	২৮
বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা / কিরীটি গুপ্ত	৩৩
ডঃ উইলিয়াম কেরীর বিজ্ঞানমনস্কতা / সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়	৩৮
সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম কেরী / মলয় দেওয়ানজী	৪৫
ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী / সুনীল দত্ত	৫২
মডেল নং—বিরানব্বুই (নাটক) / রঞ্জিত রায়চৌধুরী	৬২
মালদার মদনাবতী—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর ধাত্রীভূমি / ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ	৭৭

সম্পাদকীয়

বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরীকে ইউরোপীয় নবযুগ ও ভারতীয় রেনেসাঁসের মধ্যকার যোগসূত্র হিসাবে অনায়াসেই অভিহিত করা যায়।

১৭৬১ সালের ১৭-ই আগষ্ট ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্পটনশায়ার প্রদেশের টাউসেস্টার কাউণ্টির অধীন পলার্সপিউরি নামে একটি ছোট গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে উইলিয়াম কেরীর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম এডমণ্ড কেরী এবং মাতার নাম এলিজাবেথ উইল্‌স্‌।

কেরীর পিতা এডমণ্ড প্রথম জীবনে তাঁত বুনে জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁত বোনা ছেড়ে তিনি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা ও গীর্জায় কেরানীর কাজ গ্রহণ করেছিলেন। এডমণ্ডের শিক্ষকতা ও গীর্জায় কাজ উইলিয়াম কেরীর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা, জীববিজ্ঞান, গণিত, ভ্রমণ কাহিনী পড়ায় কেরীর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ছোটবেলার এই ছাত্রজীবনে কেরীর মধ্যে যে বহুমুখী প্রতিভার বীজ বোনা হয়েছিল, তার প্রকাশ আমরা তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র-শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার ইত্যাদিতে দেখতে পাই। ছেলেবেলায় তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে কেরী নিজেই লিখেছেন: "My education was that which is generally esteemed good in country villages, my father being a schoolmaster, I had some advantages which other children of my age had not."

লেখাপড়া শিখতে বিশেষ আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা এডমণ্ডের দারিদ্রের কারণে বারো বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হন কেরী। স্কুল ছেড়ে দিয়ে কেরী প্রথমে কৃষি খামারে এবং পরে জুতো সেলাই-র কাজ করেন। জুতো সেলাই-র কাজ করাকালীনই কেরী বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা ও লেখাপড়া শেখার কাজ চালিয়ে যান। ফলস্বরূপ কেরী শিক্ষকতা ও ধর্মীয় যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন।

এই সময় টমাস কুক ও কলম্বাসের সমুদ্র অভিযানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে কেরী বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার কাজে যেতে বিশেষ উদ্যোগী হন। কেরীর প্রথমে তাহিতি বা পশ্চিম আফ্রিকায় ধর্ম প্রচারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই সময় ভারত প্রত্যাগত জন টমাস (১৭৫৬—১৮০১) নামে

একজন চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটায় কেরী মত পরিবর্তন করে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

জন্মলগ্ন থেকে ইংল্যাণ্ডে ৩২ বছর (১৭৬১-১৭৯৩) থাকাকালীন কেরী চরম দারিদ্র ও বঞ্চনার কশাঘাতের মধ্যেও নিজেকে তৈরী করেছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই হতাশ না হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসাধারণ সক্রিয় ভূমিকার নিদর্শন রেখেছিলেন, তার পরিচয় আমরা দেখতে পাই তাঁর ভারতবর্ষে আমৃত্যু বসবাসকালীন (১৭৯৩-১৮৩৪) বিস্তৃত কর্মজীবনে।

১৭৯৩ সালের ১১-ই নভেম্বর কেরী কলকাতায় পদার্পন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমতি ছাড়াই। ভারতে মিশনারীদের উপস্থিতি কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের অবাধ লুণ্ঠন, উচ্ছৃংখল জীবনযাপন, বাণিজ্যের নামে শোষণ ইত্যাদি কাজগুলিকে বিঘ্নিত করতে পারে, এই সম্ভাবনাতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেরী ও টমাসকে ভারত যাত্রার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এই অবস্থায় কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে ভারতে এসে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সামগ্রিকভাবে ভারতীয় নব জাগরণের কাজে কেরী অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাংলা দেশে পদার্পণের মাত্র দু'বছরের মধ্যেই কেরী তাঁর মুন্সী রামরাম বসুর কাছ থেকে বাংলা ভাষা মোটামুটি আয়ত্ত করে ফেলেন এবং বাইবেলের বাংলা অনুবাদের জন্য বাংলা শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। বাইবেলের বাংলা অনুবাদে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন রামরাম বসু ও জন্ ফাউণ্টেন্ নামে একজন মিশনারি যুবক। কেরীর অধিনায়কত্বে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা ও উক্ত মিশনের কর্মধারার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপকরূপে কেরীর নিয়োগ শুধু যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশের সূচনা করেছিল তা নয়, ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বহু নতুন সম্ভাবনাময় সৃষ্টির সুযোগ হয়। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং প্রাচ্যবিদ্যাকে ইউরোপের কাছে তুলে ধরার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকটি চিরন্তন গ্রন্থকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কেরী। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদের সূত্র ধরেই কেরীর সঙ্গে

এশিয়াটিক সোসাইটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে কেরীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই প্রকৃত পক্ষে তাঁকে আরো বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ করে দেয়।

বহুভাষাবিদ পণ্ডিত হিসাবে পরিচয়ই কেরীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলে অনেকে মনে করেন। কেরীর ভাষাচর্চার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাংলা গদ্য সাহিত্য, যার স্রষ্টা হিসাবে তিনি আমাদের সকলের কাছে চির-স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাইবেল অনুবাদ, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা ছাড়াও প্রথম যে পুস্তক—"কথোপকথন" কেরী সংকলিত ও সম্পাদনা করেন তা বাংলা গদ্য সাহিত্যেরও প্রথম পুস্তক। বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও কেরী যে বহুক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং তাঁর অবদান যে বিশাল একথা অনস্বীকার্য।

বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিশেষতঃ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে কেরী এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ জশুয়া ও হানা মার্শম্যান, উইলিয়াম ওয়ার্ড ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষা দেবার যে প্রস্তাব কেরী ইংরেজ শাসন কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন নিজেই ভারতীয়দের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়। শ্রীরামপুর কলেজে কেরী নিজেই উদ্ভিদবিজ্ঞান ও কৃষি বিষয়ে ছাত্রদের পড়াতেন। কলেজে তিনি বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন। প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিনিময় করে কেরী বিশ্বজনীনতা গড়ে তুলতে এক অসাধারণ তাৎ-পর্যময় ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিজ্ঞানী হিসাবে সে যুগে কেরী ইউরোপেও যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান লাভ করেন।

বিজ্ঞানী কেরীর বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবদরদী মনই বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক কু-প্রথাগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে আজীবন নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে শক্তি জুগিয়েছিল। সাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, গঙ্গাজলি, চড়ক ইত্যাদি বিভিন্ন বর্বরোচিত কুপ্রথা কেরীর সংবেদনশীল মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এবং তারই ফলে সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালনের সংকল্প গ্রহণ করেন কেরী। কেরীর উদ্যোগেই প্রথম ১৮০২ সালে সাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কেরীই প্রথম ১৭৯৯

সালে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাই ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কেরী অবশ্যই পথিকৃতের গৌরব ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী।

ভারতীয় নবজাগরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর এই অসামান্য ভূমিকার কথা দিগদর্শনের বর্তমান বিশেষ সংকলনে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে বর্তমান প্রজন্ম কেরীর তৎকালীন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও আজকের দিনে তাঁর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে পারে।

ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে যে দিগদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হত, আজ কেরীর ভারতবর্ষে আগমনের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে সেই দিগদর্শন পত্রিকার "উইলিয়াম কেরী বিশেষ সংকলন" প্রকাশের মাধ্যমে আমরা কেরী ও তাঁর সহযোগীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছি।

আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়েও আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, অবহেলিত, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে মানবদরদী বিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক কেরীর আদর্শ বিশেষ প্রাসঙ্গিক এবং তাঁর অপরিমেয় কর্মক্ষমতা, উদার ও সংবেদনশীল মন আমাদের মুক্তির সংগ্রামী পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

আশা করি, দিগদর্শনের বর্তমান বিশেষ সংকলনটি ভারতীয় নব জাগরণের ইতিহাসকে অনুধাবন করতে পাঠক সমাজকে সাহায্য করবে এবং তাঁদের আশা পূরণ করতে সমর্থ হবে।

১১-ই নভেম্বর, ১৯৯২
১৪/২, সদর স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬।

মলয় দেওয়ানজী
সরল চট্টোপাধ্যায়

উইলিয়ম কেরী ও লোকসংস্কৃতিচর্চা

ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত*

উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে সংকলিত একটি লোককথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই আলোচনা শুরু করছি ঃ জনৈকা খাদ্যলোভাতুরা দজ্জালিনী স্বামী শাসনের প্রয়োজনে এই ছড়াটি আওড়েছিলেন—

"মাছ আনিলা ছয়গণ্ডা
চিলে নিলে দু গণ্ডা
বাঁকী রহিল ষোল
তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল
তবে থাকিল আট
দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ
তবে থাকিল ছয়
প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়
তবে থাকিল দুই
তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই
তবে থাকিল এক
ঐ পাতপানে চাহিয়া দেখ
এখন হইস যদি মানুষের পো
তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো
আমি যেই মেয়ে
তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে ॥"

হিসাব-পটিয়সী এই ডাকসাইটে জাঁদরেল মহিলার বিবরণী কেরীর সম্পাদনায় ১৮১২ সালে প্রকাশিত 'ইতিহাসমালা' বইয়ের সর্বশেষ গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু এইটিই নয় ; এ ধরণের মোট দেড়শটি কাহিনী ঐ বইতে গ্রন্থিত রয়েছে। একদিক থেকে বিচার করলে এটিকেই প্রথম বাংলা লোককথা সংগ্রহ বলে ধার্য করা চলে ; বেশ কিছু সংখ্যক প্রচলিত লৌকিক গল্প যা সেই আমলেই দক্ষিণ রাঢ়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এই বইতে সংকলন করেছিলেন কেরী। এ ছাড়াও 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা', 'কথাকোষ', 'পুরুষপরীক্ষা', 'বাসুদেবহিন্দী', 'ঈশপের

---

* ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

গল্পমালা', 'জাতককাহিনী', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'মহাবস্তুঅবদান', 'দিব্যাবদান', 'পঞ্চতন্ত্র' 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি প্রচলিত গ্রন্থাবলী থেকে কিছুসংখ্যক গল্পও নিয়েছেন কেরী। এসব ছাড়া কিছু কিছু বিদেশী গল্প এবং পশুকথা, নীতিসন্দর্ভ ইত্যাদিও এই বইতে সংকলিত হয়েছে।

অর্থাৎ, সমস্ত কিছু মিলিয়ে 'ইতিহাসমালা'-র মধ্যে নানা ধরণের গল্প সংকলিত থাকলেও, মূলত এর প্রবণতাটি লোককথা অভিমুখিনই। বিশেষত, জাতক, ঈশপকথা, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি বইয়ের গল্পগুলি যে আদিতে লোককথাই ছিল এবং পশুকথা তো বটেই, এমন কি কিছু কিছু নীতিসন্দর্ভও [বা, প্যারাবল] যে লোককাহিনীর বর্গভুক্ত—এই অভিমত এখন লোকসংস্কৃতির গবেষকরা সবাই মেনে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি।

॥ ২ ॥

কেরী, লোকসংস্কৃতির ফলিত-চর্চায় অবশ্য 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হবার প্রায় এক দশকেরও আগে থেকেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর 'কথোপকথন' তথা 'ডায়ালোগ্‌স' বইটির কথা বলছি। এই বইয়ের প্রকাশকাল হচ্ছে: আগস্ট, ১৮০১। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সংস্করণে কেরীর নাম কোথাওই ছিল না। ১৮০৬ খৃস্টাব্দের ২য় সংস্করণেও তাঁর নাম সংযুক্ত হয়নি। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হলে তাঁর নাম সংযুক্ত হয় সরাসরি। বইটির 'Colloquies' রূপেও একটি পরিচিতি সূচক শীর্ষক রয়েছে।

এই 'ডায়ালোগস' ওরফে 'কলোকীজ'-ওরফে 'কথোপকথন'-ই হল এক অর্থে প্রথম লোকসংস্কৃতি-সম্পৃক্ত বাংলা বই। মূলত শ্রীরামপুর অঞ্চলের [সেটাই স্বাভাবিক ; কেরী দীর্ঘদিন শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বহুকাল ঐ এলাকায় বাসও করেছেন] মানুষের মৌখিক কথাবার্তার, জীবনচর্যার, আচার-সংস্কারের, প্রাত্যহিক রীতিনীতির, সামাজিক বিধি-বিধান ইত্যাদির খুব নিখুঁত এবং অভিনিবিষ্ট চিত্রায়ণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। সংলাপের মাধ্যমে প্রতিবেদন করা এই সব বিষয়গুলি ঠিক যেন আলোকচিত্রের মতোই জীবন্ত মূর্তিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

বইটিকে একটু আগে লোকসংস্কৃতির ফলিত-চর্চার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছি। এর কারণ আর কিছুই নয়: স্থানীয় ভাষা, রাজনীতি, আচার-সংস্কার, বিধি-বিধান ইত্যাদির সম্পর্কে অভিজ্ঞ কিছু এদেশীয় বিচক্ষণ মানুষ [ভূমিকায় কেরী যাঁদেরকে "sensible natives" বলে আখ্যা দিয়েছেন] এই সংলাপগুলি সংরচন করেছিলেন। এই সংকলনের রচয়িতা কারা ছিলেন বই থেকে তার কোনো হদিশ না মিললেও, জনজীবনের সঙ্গে যে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবেই সংযুক্ত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই ; তার কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের

বাগরীতি, বাচনভঙ্গী শব্দপ্রয়োগ, উপমা-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। এই বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মুখের ভাষাই নিখুঁত ভাবে পুনর্গঠন করেছেন কেরীর সহযোগীরা। এই সমস্ত স্তর পর্যায় কাদের নিয়ে গঠিত ছিল তার কিছু কিছু পরিচয় সংলাপগুলির শিরোনাম বিশ্লেষণ করলেই মিলবে ঃ

চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনশি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক, প্রাচীন প্রাচীন, সুপারিশ, মজুরের কথাবার্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি. হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা. স্ত্রী-লোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কায চেষ্টার কথা, কন্দল, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন।

এই একত্রিশটি অংশের শীর্ষক থেকে দেখা যাচ্ছে সমাজের ওপরতলার, মাঝের তলার এবং নীচের তলার—অর্থাৎ সমস্ত স্তরের মানুষেরই জীবনচর্যার প্রতিবিম্বন ঘটানো হয়েছে এদের উপজীব্য সংলাপ-সংরচনের মধ্যে। বাবু, সাহেব, জমিদার, মহাজন যেমন,—তেমনই ইজারাদার, যাজক, খাতক, উমেদার, যজমান, মুনসি প্রমুখ—আবার মজুর, জেলে, আসামি, রায়ত, ভিক্ষুক—সবাই এই বইয়ের সংলাপের মাধ্যমে হাজির। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, শিশু, নারী সবাই রয়েছে। এক কথায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ; কিংবা আপামর লোক-সাধারণ। চাকরীর উমেদারি, ঘটকালি, হাটবাজার করা, ঝগড়াঝাঁটি বাধানো-চালানো-এবং-থামানো ইত্যাদি—প্রাত্যহিক জীবনচর্যার বহুবিধ উপকরণ এদের মধ্যে মিলছে। আরো মিলছে, বিশ্বাস-সংস্কার-পূজা-অর্চনা-রীতি-বিধি ইত্যাদির হদিশ। সব মিলিয়ে, জনজীবনের সংস্কৃতির ব্যবহারিক বিকাশের বহুবিচিত্র দিক এদের মধ্যে ধরা পড়েছে। সংস্কৃতির মানস-সম্পদের দিকটি এর ব্যবহারিক বিকাশের অন্তর্কাঠামোকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে যে, সেকথা এখানে মনে করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির বিশেষতঃ তার লোকায়ত পর্যায়ের ভিত্তি যে এইগুলিই ; এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে লোকসংস্কৃতিচর্চায় কেরীর অবদান কি, তার মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

॥ ৩ ॥

কেরী অবশ্য বলেছেন যে এই সংলাপগুলি প্রাজ্ঞ এদেশীয়দের দ্বারা সংরচিত,তবু এদের স্বাভাবিকতা এবং বাস্তবধর্মিতা এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে – সর্বত্রই এগুলি কল্পনাপ্রসূত, এমনটা মনে করা যাচ্ছে না। বাস্তব সংলাপের একটা করে অভ্যন্তরীণ কাঠামো নিশ্চয়ই এদের মধ্যে আছে, তা না হলে নিছক বানানো সংলাপ এতটা মাটির স্পর্শে-গন্ধে-স্বাদে ভরা হতে পারত না। কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করি বরং ঃ

যেমন ঃ ক) 'তিয়রিয়া কথা' থেকে—

১ম···"হারে ভেগো মাচকে যাবি কিনা আতি যে কোয়া ২ করিচে। মুই ফুকারছি তুই ঘুমাইছিস।

২য়···যা চেঁদে তুই মুই তো এখন যাবনা, কালি ঢের আতি থাকিতে গিয়াছিনু। ·আজি ম্যাগ পড়েছে।

১ম...তোর দেখি বড় সুকবাসের শরীল হইয়াছে।"

খ) 'মজুরের কথাবার্ত্তা' থেকে—

"মুই সে বাড়িতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।"

গ) 'স্ত্রিলোকের হাট করা' থেকে—

"আর হাটপানে মুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাক কাপাইস আনিতে হইবে···"

স্পষ্টতই, মূল লৌকিক সংলাপের কাঠামোর ওপরে কেতাবী ভাষার আলতো একটা প্রলেপ পড়েছে ; বিশেষত অনেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার ব্যবহারে ['থাকিতে' / 'হইয়াছে' / 'করিতে' / 'করিয়া-ছিলাম' / 'দিয়া' / আনিতে হইবে' 'ইত্যাদি] এটা স্পষ্টই প্রকট। কিন্তু এ-সত্ত্বেও এদের লৌকিক চরিত্রটির মৌলিকত্বে কোনো সংশয় নেই। 'মাচকে' / 'আতি' / 'কোয়া' ২ / 'শুকবাসের শরীল' / 'মুই' / 'ঠেঁটা' / 'হারামজাদগি' / 'মুয়াতে' / 'বেসাতি পাতি'-ইত্যাদি প্রয়োগ এই কথার প্রমাণ হিসেবে ধার্য। কেরী হয়ত খানিকটা নিজের অজান্তেই এইভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রাথমিক ভিতটি গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতে-বা-অজ্ঞাতে যাই হোক না কেন, তাতে তাঁর এই বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রসূরিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুতি ঘটেনা। বিশেষত, সম্পাদক হিসেবে প্রতি সংস্করণেই তিনি ভাষার সহজাত স্বাভাবিক রূপটিকে উত্তরোত্তর পরিস্ফুট করতে উদ্যোগ নিয়েছেন ঐ প্রবণতারই সূত্রে।

শুধুমাত্র ভাষা, কিংবা সামাজিক-আর্থনীতিক চিত্রই নয়—'কথোপকথনে'র মধ্যে স্থানীয় বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদির খোঁজও যথেষ্ট পরিমানেই মিলবে। এই বইয়ের 'কন্দল' শীর্ষক অংশটির থেকে প্রাসঙ্গিক উপকরণ উদ্ধৃত করি। বরং খানিকটা ঃ

"এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাদ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাইটের বাছা জ্বরে ঝাঁউরে পড়েছে।"

এখানেও 'কালি' / 'ডাড়িয়াছিল' / 'বুড়া' / 'চারি' / 'করিলে' / 'দিয়া' /

ইতে' / 'যাইটের'—প্রভৃতি লৈখিক প্রয়োগ ঘটেছে। তবুও, এই ছবি বাস্তবের শ্বস্ত প্রতিরূপ। এই সব 'আয়-পয়'-ঘটিত মেয়েলি বিশ্বাসের চিত্রায়ণ করা া নইলে সম্ভবপর হতো না। যেসব মেয়েলি গালাগালি চোস্ত ঋজুতায় এর ধ্যে যথাযথ প্রয়োগ করা হয়েছে এই অধ্যায়টিতে, শুধুমাত্র জনজীবনের ঙ্গে গাঢ় পরিচিতি থাকলেই তা পারা সম্ভবপর হয়। পুকুরধারের পাকুড় ংবা অশ্বত্থ গাছের আড়াল থেকে টেপ-রেকর্ডারে ধরে নিয়ে পরে লিপি-তিবেদন করা হয়েছে এমন কথা বলার সুযোগ থাকলে অবশ্যই তাই বলতুম! করীর সংকলক বা সহযোগীদের মধ্যে বঙ্গললনা কেউ ছিলেন এবং তাঁরাই এই ব গালাগালির সুবিন্যস্ত লিপি-রূপ গড়ে দিয়েছিলেন, সেটি বলতে পারলেও বস্তি পাওয়া যেত। এর কোনটিই বলতে পারছি না ; সুতরাং ক্ষেত্র-সমীক্ষণ তখানি নিষ্ঠার সঙ্গে করা থাকলে তার ফলশ্রুতিতে এ-জিনিষ লিখে ফেলা ম্ভব, সেটা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত। বরং, ঐ-সব কোন্দলিনী মহিলাদের কছু কুঁদুলে গালমন্দের নমুনা আপনাদের শোনাই তা'হলে বক্তব্যটা কিছু বচ্ছ হবে ঃ ['কন্দল' থেকে]

[প্রথমা] "এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিনদিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।..."

[প্রত্যুত্তরে, দ্বিতীয়া] "হাঁলো ঝি জামাইখাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা।..."

[প্রথমা, পাল্টা জবাবে] "হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যেন কালি প্রাতঃকালে বাছা ২ করে কাঁদে তবেই ও অঙ্কারির অঙ্কারে ছাই পড়ে।..."

[দ্বিতীয়া, দ্বিগুণ বিক্রমে] "ও লো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাটবাজার কুড়ানি খানকি খা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুন্দলি।..."

[তৃতীয়া, মধ্যস্থতার প্রয়াসে] "আই ২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই।"

এমন বাঁধুনি, এ রকম অবিরল প্রবহমান শব্দগুচ্ছ, এই সুনিশ্চিত কটুবাক্য চয়ন—এ ঠিক বানিয়ে লেখা যায় না। শুধুমাত্র বিলিতি সাহেবসুবো কর্ম-চারীদের বাংলা শেখানোর ব্যাপারটাও এমন স্বতঃস্ফূর্ততার উপলক্ষ হতে পারে না। ক্ষেত্র-সমীক্ষণ কোনো-না-কোনোভাবে করতেই হয় লোকজীবনের

এত পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ করতে হলে। কেরী সেই সমীক্ষণের মুখ্য পরিচালক ছিলেন সন্দেহ নেই। এই রকম মাটির কাছাকাছি থাকার কারণেই তাঁর পরিচালনায় তৈরী এই গ্রন্থের লোকজীবনচর্চা এত স্বচ্ছন্দ।

॥ ৪ ॥

"ইতিহাসমালা'-র প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করা গিয়েছিল, সেখানেই ফের ফিরে আসি। যে বই থেকে প্রতীচ্যদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে লোককাহিনী-চর্চার সূত্রপাত, যথাক্রমে ইয়াকোব এবং ভিলহেল্‌ম নামের গ্রিম-পদবীধারী দুই ভাইয়ের সংকলিত 'কিণ্ডার উণ্ড হাউজমার্শেল' নামে সেই বইয়ের ঠিক সমান বয়সী [উভয়েরই প্রকাশ ১৮১২ সালে] হলেও, কেরীর বই সেভাবে পরিচিতি অর্জন করতে পারেনি। গ্রিমভাইদের লোককথা-সংকলনের মতো একটি সাংস্কৃতিক যুগের উদ্বর্তন ঘটাতে পারা তো আরো দূরের কথা। এর একটি কারণ অবশ্য, সম্ভবত ১৮১২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে আকস্মিক অগ্নি কাণ্ডে মাত্র তিন-চারটি কপি ছাড়া 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের সম্পূর্ণ সংস্করণ-টিরই নষ্ট হওয়া। ফলে এই বই কোনোদিনই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত হতে পারেনি এবং কালক্রমে বিস্মৃতই হয়ে গিয়েছিল।

'ইতিহাসমালা'-র প্রথম সংস্করণের যে সামান্য কয়েকটি খণ্ড বিনষ্ট হবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, তাদের কোনোটিরই কোনো শিরোনাম ছিল না। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ স্যামুয়েল পীয়র্স 'উইলিয়ম কেরী' নামে যে বই লিখে-ছিলেন, তাতে এই বইয়ের চল্লিশটি গল্পের সারানুবাদ যা করেছিলেন, সেগুলোও শিরোনামহীন। প্রথম সংস্করণের ১৬০ বছর পরে ফাদার দ্যতিয়েন নূতন ভাবে সম্পাদনা করে যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাতে তিনি গল্পগুলির শিরোনাম দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সুকুমার সেন 'ইতিহাসমালা'-র যে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, তাতে তিনি দ্যতিয়েন-প্রদত্ত নামকরণই অনু-সরণ করেছেন। সুকুমার বাবু এই বইয়ের মোট একত্রিশটি গল্পকে খাঁটি দেশী লোককথা বলে ধার্য করেছেন। তাঁর মতে ঃ এই বইয়ের বাকি গল্পগুলির মধ্যে—বারোটিকে আদৌ কোনো কাহিনী বলা চলে না, এগুলি বিচ্ছিন্ন কিছু সংস্কৃত শ্লোকের গদ্যরূপ মাত্র। চারটির মধ্যে কোনো কাহিনীগত উপাদান নেই। পঞ্চতন্ত্রের থেকে চৌদ্দটি, বেতালপঞ্চবিংশতির থেকে দুটি, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকার থেকে একটি, কথাকোষ-পুরুষপরীক্ষা-বাসুদেবহিন্দী প্রভৃতি বইয়ের থেকেও একত্রিশটি, ঈশপ'স ফেব্‌লস থেকে চারটি—জাতক [অথবা ঐ ঈশপ থেকেই] আরো একটি, ইউরোপীয় উৎস থেকে আটটি, পারসিক উৎস থেকেও ততগুলিই এবং দেহাতী হিন্দী উৎস থেকে তিনটি, ঐতিহাসিক কিংবদন্তী চারটি, কবিকঙ্কনচণ্ডী থেকে একটি এবং নীতিকথা-পশুকথা [প্যারাব্‌ল ও ফেব্‌ল] পঁচিশটি। মোট একশো পঞ্চাশটি।

লোকসাহিত্যের বিদ্যাশৃঙ্খলার অনুগত ছাত্র মাত্রেই এই বর্গবিভাজনকে খুব সুসঙ্গত বলে গণ্য করতে অপারগ হবেন। কেন না, শ্রদ্ধেয় শ্রী সেন নিজেই নিজের বক্তব্যের বিপরীত কথা বলেছেন কোনো জায়গায়। উদাহরণতঃ বত্রিশ সংখ্যক গল্পটিকে তিনি ভূমিকার যে অনুচ্ছেদে "genuine folk-tale" বলে আখ্যাত করেছেন—ঠিক তার পরের অনুচ্ছেদেই তিনি এটিকে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবস্তু অবদান' এবং খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের বৌদ্ধ কাহিনী সংগ্রহ 'দিব্যাবদান' এবং 'পঞ্চতন্ত্রে' পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন। মহাকোশল এবং ওড়িশার লৌকিক কথার মধ্যেও এটিকে পাওয়া গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অর্থাৎ, এখানে দো-রোখা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে ঃ এক, লোককথা—থেকে—পরিশীলিত সাহিত্য ; দুই পরিশীলিত সাহিত্য—থেকে—লৌকিক সাহিত্য—এর যে-কোনো একটি পথ ধরে গল্পটি সঞ্চরণ করেছে। গল্পটির উপকরণ বিচার করলে দ্বিতীয় সম্ভাবনাই প্রবলতর বলে প্রতীতি হয় ঃ এক দুশ্চরিত্রা রাণী রাজাকে হত্যা করে এবং উপপতিকে মৃত দেখে দেশান্তরে গিয়ে গণিকা-জীবন গ্রহণ করে। কালক্রমে তার নিজের ছেলেও বয়োপ্রাপ্ত হয়ে গণিকাবিলাসী হয়ে ওঠে এবং ঘটনা-পরম্পরায় নিজের মায়ের সঙ্গেই অবৈধ জীবন যাপন করতে থাকে—অবশ্য না জেনে। কিন্তু অজাচারিণী রাণী নিজের ছেলেকে ঠিকই চিনতে পারে। এর পর রাজপুত্রের মৃত্যু, রাণীর সহমরণে উদ্যত হয়েও আগুনের ভয়ে পালিয়ে এসে এক গোয়ালার রক্ষিতারূপে থাকা এবং কাহিনীর অবশেষে, বিবেক যন্ত্রণায় উন্মাদবৎ আচরণ করা—ইত্যাদি বিবরণ আছে।

বাংলার লোককথায় অজাচারের ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে ঃ দেড়হাজার-করা একটিরও কম। অন্য সাংস্কৃতিক বলয়ে এটা কিছুটা থাকলেও বাংলার লোককথার ক্ষেত্রে এই ধরণের বিষয় থাকা প্রায় অসম্ভাব্য। তাছাড়া, এই গল্পের অশালীন রুচিগত অপহ্নব ওপরতলার গল্পে যতখানি সম্ভাব্য, ততখানি অন্য বলয়ের লোককথার মধ্যেও সম্ভাব্য নয়। ফলে এটিকে "genuine folk tale" বলে গণ্য না করাই সঙ্গত। ওপরতলা থেকে নীচের তলায় চুঁইয়ে নামারই ফলশ্রুতি এটি।

এই প্রসঙ্গটি এতটা বিস্তৃত করে বলতে হল এই জন্যে যে, কেরীর এই সংকলনে লোককথা অনেকগুলিই আছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে যাকে লোককাহিনী বলে মনে করা হয় তাদের সবগুলিই প্রকৃত লোককথা নয়। অবশ্য আজকে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, কেরীর আমলে তার কণা পরিমাণও ছিল কি-না সন্দেহ। কেরীর সম্পাদিত এই বইতে তথাকথিত 'গ্রেট ট্র্যাডিশ্যন' এবং 'লিট্‌ল ট্র্যাডিশ্যান' বলে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে যা বিবেচিত—তার দুটি উৎস থেকেই কাহিনী গৃহীত এবং গ্রন্থিত হয়েছে। লোককাহিনীর নিজস্ব চরিত্রগুণ কি-কি, সে সম্পর্কে সেই আমলে প্রাচ্যে

প্রতীচ্যে সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি ; গ্রিমদের বইকে অবলম্বন করে কিন্তু পরবর্তীকালে তার সূত্রপাত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে 'পপুলার' এবং 'সোফিস্টিকেটেড' বা 'ক্ল্যাসিক্যাল' ট্র্যাডিশ্যন—সমস্ত উৎস থেকেই এই বইয়ের জন্য কাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছিল—হয়ত বা কেরীর ব্যক্তিগত ঝোঁকেই—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনায় এই বই যে ছিল না একেবারেই,, পারিপার্শ্বিক তথ্য-বিচারে সে-কথা বোঝা যায়।

অর্থাৎ, ব্যক্তিগতভাবে লোককাহিনী সংকলনের ব্যাপারে কেরীর কোনো অনীহা ছিল না, পক্ষান্তরে এতে তাঁর আগ্রহই যে ছিল—সেটি বলা সঙ্গত। লোকসংস্কৃতি বলে সুনির্দিষ্ট একটি বিদ্যাশৃঙ্খলা তখন যেহেতু গড়ে ওঠেনি, তাই নিখুঁত বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন সেখানে ঘটেনি [আজো কি ঘটে! অন্তত, এ দেশে?]—কিন্তু তাতে করে কেরীর লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের অভাব বোঝায় না।

॥ ৫ ॥

এই ধরণের সংকলন গ্রন্থ [যার মধ্যে লৌকিক এবং পরিশীলিত—দুই বর্গেরই কাহিনী গ্রন্থিত, দুয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ের কিছু আংশিক-মিশ্রিত গল্পও যেখানে রয়েছে] থেকে সুনিশ্চিতভাবে কোনো কোনো গল্পকে লোককাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করতে গেলে লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের জগতে সর্বস্বীকৃত কোনো একটি বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে অবলম্বন করতে হয়। 'ইতিহাসমালা'-র ইংরাজী অনুবাদে যে-গল্পগুলিকে লোককাহিনী বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এ রকম কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি অবশ্য। সুতরাং সরাসরি 'এই এই গল্পগুলি লোককথা' এমন সিদ্ধান্ত মানবার অসুবিধা আছে।

যে-সব পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকৃতই লোককথা কি—না কোনো প্রচলিত গল্প, তাদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় আর্নে-টম্পসন-নির্দেশিত টাইপ-মোটিফ পদ্ধতি। [ফিনীয় পণ্ডিত এণ্টি আর্নে এবং তার আমেরিকান উত্তরসূরী স্টিথ টম্পসন দেখিয়েছেন বিশ্বের সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েরই কতকগুলি নিজস্ব-ধরণের কাহিনী-প্রকরণ (টাইপ) এবং নিজস্ব কিছু-কিছু ছোট-ছোট বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন কাহিনী অভিপ্রায় (মোটিফ) আছে। এই প্রকরণ এবং অভিপ্রায়গুলি সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ করে এদের বিশ্বজনীনভাবে গ্রহণীয় কিছু রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আর্নে এবং পরবর্তীকালে করেছেন টম্পসন। ২,৫০০ টাইপ এবং ২৫,০০০ মোটিফ মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছে, যদিও এই সংখ্যা,—বিশেষত মোটিফের ক্ষেত্রে, উত্তরোত্তর বর্ধমান।]

টাইপ-মোটিফ পদ্ধতির মাধ্যমে যাচিয়ে নিয়ে এই সংকলনের এইসব গল্পগুলিকে লোককাহিনী হিসেবে নিশ্চিন্তে স্বীকৃতি দেওয়া যায় [গল্পের শীর্ষক

সংখ্যাকে সূচক হিসেবে ধার্য করে] :

'১১' : এর মূল উপজীব্য, বেশি চালাকি করতে গিয়ে ধরা পড়া। বিশ্বজনীন ভাবেই এটি একটি বহুল প্রচলিত অভিপ্রায়। মোটিফ সূচক—জে. ১৩০৯.১.১।

'১৬' ঃ বোকা বাঘকে বিয়ে দেবার নাম করে ঠকিয়েও নিরাপদে থাকা এবং ঘটকবিদায় পাওয়া। এই গল্প পি. ও. বোডিং-এর 'সান্তাল ফোক্ টেলজ্' এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'-তে আছে। মোটিফ—বি. ১৩০৯.১.১।

'২১' ঃ সঙ্কেতচিহ্নের মাধ্যমে পরিচয় জানিয়ে প্রেম। এটি বহু-পরিচিত মোটিফ। এ. ই. ড্রাকোটের 'সিমলা ভিলেজ্ টেলজ্' এবং সি. সুইনার্টনের 'ইণ্ডিয়ান নাইট'স এণ্টারটেইনমেণ্ট'-এ মিলবে। মোটিফ টি. ৪১.৩।

'২২' ঃ এটির মধ্যে লোককাহিনীর উপকরণ সামগ্রিক নয়, আংশিকভাবে প্রাপ্তব্য। মোটিফ ঃ ধাঁধার মাধ্যমে বক্তব্যের প্রতিবেদন। এখানে পরীক্ষার জন্য ধাঁধাভিত্তিক সঙ্কেত ব্যবহৃত। মোটিফ সূচক—এইচ ৫৩০ এবং এইচ ৫১০।

'২৩' ঃ শেয়াল পণ্ডিতের কুমীরকে তার ছানা খেয়ে ঠকানো। এই গল্পও 'টুনটুনির বই'-তে সংকলিত। মোটিফ সূচক—কে. ৯৩১.১; টাইপসূচক —৫৬-সি।

'২৬' ঃ গুরুর উপস্থিত বুদ্ধিতে শিষ্যের প্রাণরক্ষা এবং স্বর্গে যাবার লোভে বোকা রাজার মৃত্যুবরণ। এ গল্প দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'দাদা-মশায়ের থলে'-তে আছে। মোটিফ সূচক ঃ জে. ৩৪২.১.১ এবং জে. ১১৮৯.৩; টাইপ সূচক ঃ ১৫৩৪।

'৪০' : জাদুসূচক কিছুর মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন এবং বিস্ময়কর ঘটনা ঘটা। এটিই এই বইয়ের মধ্যে একমাত্র পরিপূর্ণ রূপকথা। এই মোটিফও বিশ্বজনীন। মোটিফ সূচক : ডি. ৫৬২.১. ডি, ৭০০ এবং এম. ১৩৮.১। ডি. এন. নিয়োগীর 'টেল্‌জ সেক্রেড অ্যাণ্ড সেকুলার', আশরাফ সিদ্দিকীর 'আমার দেশের রূপকাহিনী' বইতে গল্প আছে এই মোটিফের।

'৪৫' : বাঁদর কর্তৃক মূর্খ কুমীরকে ঠকানো। বিশ্বজনীন অভিপ্রায়। মোটিফ সূচক : কে. ১.১.১।

'৪৮' ঃ জীবন্ত প্রাণীকে কেটে ভাগ করার প্রস্তাবের সাহায্যে প্রকৃত মালিক নির্ণয়। বিশ্বজনীন টাইপ—'সলোমন'স জাস্টিস' রূপে পরিচিত। টাইপ সূচক—৯২৬। জি. আর. এস. পানতুলুর 'ফোকলোর অব দ্য তেলেগুজ' বইতে এরকম গল্প আছে।

'৯৩' ঃ জাদুপাত্রের সাহায্যে ধনী হওয়া। এই মোটিফ লোককথায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। মোটিফসূচক—ডি. ১১৭১.১। সি. এ. কিংকায়েডের 'টেলজ্ অব সিন্দ্'-এ এই গল্প আছে।

'৯৮' ঃ কথার ভেল্‌কিতে চোর ধরা। এই মোটিফ স্লাভ উপকথায় বা স্কাজ্‌ঈতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেও প্রচলিত। মোটিফ-সূচক জে. ১১১৪.১.৫.১।

'১০৪' ঃ বোকার মতো কথা বলে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে ফেলা। ভেরিয়ার এল্‌উইনের 'মিথ্‌স অব মিড্‌ল ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে এই মোটিফের গল্প আছে কয়েকটি। এটিও আংশিক মোটিফ। সূচক—জে. ১৩০৯.১.১।

'১৩৮' : পিঠে খাওয়ার জন্য ঝগড়া করে মরার মতো পড়ে থাকা এবং 'মৃত'-রা খাবার কথা বলছে শুনে শ্মশানযাত্রীদের ভয় পাওয়া – এই গল্পের সঙ্গে, নিজেকে বাদ দিয়ে সবাইকে গুণে একজনকে 'কম' পাওয়ার গল্পটি মিশেছে এখানে। সি সুইনার্টনের 'ইণ্ডিয়ান নাইট স এণ্টারটেইনমেণ্ট', পি. সি. রায়চৌধুরীর 'ফোক টেল্‌জ অব্‌ বিহার'-এর মধ্যে এমন গল্প আছে। টাইপ ১৩৫১ ও ১২৮৭ ; মোটিফ জে. ২৫১১.১ ও জে. ২০৩১.৭।

'১৪৩' ঃ আকস্মিকভাবে কোনো কিছুর সম্পর্কে অবগত হয়ে ভাগ্য ফেরানো। মধ্যপ্রাচ্যের প্রচলিত লোকগল্পধারায় পাওয়া যায় প্রচুরভাবে। মোটিফ —এল ২১০.১.১।

'১৪৯' ঃ তুচ্ছ প্রাণীর কাছে একটি টাকা থাকায় নিজেকে রাজার সমতুল্য বলে ভাবা। 'টুনটুনির বই'-তে এই মোটিফ আছে। মোটিফসূচক ঃ এল. ৪২৭.১.১।

'১৫০' ঃ লোভী স্ত্রীর স্বামীকে ঠকানো। বাংলা লোককথার প্রচলিত মোটিফ। সূচক সংখ্যা—কে. ২১১৫.১।

মোট ১৫টি ; এই বইয়ের শতকরা ১০% টি গল্প।

লোকসংস্কৃতির চর্চা করবার সচেতন অভিপ্রায় নিয়ে উইলিয়াম কেরী যে 'কথোপকথন' কিংবা 'ইতিহাসমালা' সংকলন করেছিলেন যে, তা নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে নর্টন, লালবিহারী, লঙ, মেরী ফ্লেরী, ষ্টিল-টেম্পল, লোলেস জ্যাকব—প্রমুখ লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের অগ্রসূরী হিসেবে তাঁকে গণ্য করতেই হবে। তাঁর প্রাথমিক ভিত্তি সংগঠক-কাজকে—হতে পারে, তা হয়ত অসচেতনভাবে করা—কিন্তু তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেই হবে॥

—ঃ—

জাগরণের ধারায় কলকাতার কয়েকটি সংস্কৃতি পীঠ ঃ সেকাল একাল

শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী*

পৃথিবীর সব আরম্ভেই নিহিত আছে উত্তেজনা। উনিশ শতকের বাঙলা এমন অনেক আরম্ভের উত্তেজনায় উদ্দীপিত উজ্জীবিত হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির সেই জাগরণের ইতিবৃত্ত নিয়ে যেমন এখনও ভাবালু মুগ্ধতা, বিতর্কিত মূল্যায়ণ, চুলচেরা বিশ্লেষণ কিংবা অবজ্ঞার বক্রোক্তি অন্য কোনো চিন্তা-আন্দোলনকে নিয়ে বোধ হয় তেমনটি আর হয় নি!

নবজাগৃতির এই মূল্যায়ণের আলোচনায় সেযুগের ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের কর্মকৃতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে সঙ্গত কারণেই। এঁরা ব্যক্তির স্তর থেকে ক্রমেই হয়ে উঠেছেন এক একটি প্রতিষ্ঠান। তবু মনে হয় এই জাগরণের ধারায় সৃষ্ট-পুষ্ট-লালিত অসংখ্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে এইসব আলোচনায় প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক অধিকার দিতে একটু কৃপণ থেকেছি আমরা। স্বভাবতই যা হয়, কখনো প্রতিষ্ঠানকে ছাপিয়ে প্রলম্বিত হয়ে গিয়েছে ব্যক্তির দীর্ঘায়িত ছায়া।

সামাজিক, রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক কয়েকটি পীঠস্থান বা সংস্থা জাগরণের ধারায় কেমন করে উঠেছে-ডুবেছে, ভেসে যেতে গিয়ে বেঁচেছে কিংবা যায়নি—গত পৌনে দু'শ বছরের কালপরিধিতে তার এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিতে চেষ্টা করবো এই আলোচনায়।

বেঁচে থাকার অর্থকে আরো মহিমময়, জীবনকে আরো আকর্ষণীয়, হৃদ্য এবং আনন্দদায়ক করে তুলতে কুসংস্কার ও অশিক্ষার অপসারণে স্থায়ী পথ-নির্দেশ দিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের অজান্তেই শুরু করেছিল তাদের বিশেষ যাত্রা। এদের সফলতা ও ব্যর্থতার বীজটি কি জাগরণের ওই ধারায়ই নিহিত রয়েছে?

আমাদের কালের এক ঐতিহাসিক এতদ্দেশীয় নবজাগরণতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন, প্রতীচ্যের উদারনৈতিক চিন্তাধারা এবং প্রাচ্য ঐতিহ্যবাদ এ দুয়ের সমন্বয় নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের দিক্-সন্ধান—ক্বচিৎ কদাচিৎ আপোষ, বিরুদ্ধযুক্তির সহাবস্থান, ভিন্ন আদর্শের সারগ্রাহী সমাহার এবং মেরুকৃত চিন্তার সংঘাত নবজাগৃতির অন্যতম যুগ-লক্ষণ। তবে সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে পশ্চিমী উদারতার সেই নতুনের প্রতি আকর্ষণ যার যাদুস্পর্শে সেযুগে আমাদের কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে

---

* ডঃ শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী ভারতীয় যাদুঘরে উপনির্দেশক হিসেবে কর্মরত।

জোয়ার এসে গিয়েছিলো হঠাৎ করে। অতীতমুখিতা পরিবর্তিত হচ্ছিল ভবিষ্যচিন্তায়। আমাদের আলোচ্য প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রবহমান ধারায় গড়ে উঠে এগিয়ে পিছিয়ে কতটা সমাজসন্নিধি লাভ করেছে তাই এখন দেখবার!

জাগরণের যে যুগসন্ধি তার বেশ কয়েক বছর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্যার উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিলো সেই বিদ্বজ্জনসভা যার লক্ষ্য ছিলো মানুষ এবং প্রকৃতি,—প্রথমটির সবরকমের কৃতি, আর দ্বিতীয়টির নানাবিধ সৃজনী! একটা অবশ্য ভৌগোলিক বেড়াজাল বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো, সেটি এশিয়া ভূখণ্ডের। এশীয় প্রকৃতি এবং মানুষের চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠলো এশিয়াটিক সোসাইটি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে—জাগরণযুগের অগ্রদূত হিসেবে। ইউরোপের সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধি ও চিন্তার দুই মহা আন্দোলন এনলাইটেনমেণ্ট ও রেনেশাঁ এদের অন্যতম, প্রথমটি যার নজর ছিলো প্রধানত প্রকৃতি ও মানুষের কৃতকর্মের অধ্যয়ন ও চর্চা, তার প্রত্যক্ষ ছাপ দেখা গেল এশিয়াটিক সোসাইটি গঠনে জোন্সের চিন্তায়। এর তিরিশ বছর পর ওই এশিয়াটিক সোসাইটির কোলে জন্ম নিলো ইউরোপীয় রেনেশাঁর আরও এক এশীয় ফসল 'এশিয়াটিক মিউজিয়াম'—যত কিছু প্রাচীন বস্তু সম্ভার তার প্রতি এক অপরিসীম কৌতূহলে আবিষ্ট, আক্রান্ত হয়ে।

অনেকের মতে এদেশে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিকতার শুরু। কলকাতা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক ঘটনা-বহুল বছর। সে বছর কলকাতার প্রথম বিশপ ডঃ টমাস ফ্যানশ মিডল্‌টন্ পা রাখলেন এই শহরের মাটিতে। চুঁচুড়ায় দেশের প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হল রেভারেণ্ড মে সাহেবের উদ্যোগে! সেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন সাগর পারের দেশে স্টিম ইন্‌জিনের আবির্ভাব জগতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিনের ঘোষণা করলো, তখন কলকাতায় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আর এক নবজাগরণের ভোর। নগর উন্নয়ণের জন্য কলকাতার দায়িত্বভার তুলে নিলেন লটারি কমিশন। কলকাতার মাটির নীচে ১৪০ ফুট বোরিং করে স্বাদু জলের বন্দোবস্ত করা হল ইংরেজটোলায়। ওই বছরেরই মাঝামাঝি রামমোহন রায় পাকাপাকিভাবে বাস করতে এলেন কলকাতায়—তাঁর সমাজসংস্কার আন্দোলন জোরদার করবেন বলে। তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লর্ড মিণ্টোর আমল শেষ হয়েছে। বছরখানেক আগে মার্কুইস অব্ হেস্টিংস (১৮১৩—১৮২৩) ইংরেজ রাজত্বের রশি ধরেছেন। ওদিকে গঙ্গার পাড়ে নগরবাসীর সাত লাখ টাকায় তৈরি হয়েছে 'বিশাল টাউন হল, মোটা মোটা থাম, হিত-কার্য্যসাধন সভা করিবার ধাম'। তাছাড়া এক নতুন চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩—১৮৩৯) এবং চৌরঙ্গী ড্রামাটিক সোসাইটি গড়ে উঠে কলকাতার সংস্কৃতিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। শুভারম্ভ হয়েছে এক নতুন কালের বন্দনার।

এক বন্দীর বন্দনা দিয়ে শুরু করতে হয় যাদুঘরের নান্দীপাঠ। এশিয়াটিক মিউজিয়াম থেকে যা আজ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম। বন্দীটির নাম ডঃ ন্যাথানিয়েল ওয়ালিক। জাতে দিনেমার, পেশা সার্জারি, নেশা দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালি সংগ্রহ করা। শ্রীরামপুরের নাম তখন ফ্রেডারশি-নাগোর—ডেনিশদের উপনিবেশ। ১৮০৭ সালে যে বছর কোপেনহেগেন থেকে সাগরপাড়ি দিয়ে শ্রীরামপুরে তিনি আসেন সে বছরই তাঁর দেশে প্রথম মিউজিয়াম ন্যাশনাল মুজিতে'র ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো। বুকের মধ্যের সেই আলোড়নকে সাত বছর বাদে প্রস্তাবাকারে পৌঁছে দিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তাব্যক্তিদের কাছে। প্রস্তাব রূপায়িত হল সংগঠনে। তৈরী হল দেশের প্রথম সংগ্রহশালা—যে ভবনে ক্রমশ সমৃদ্ধ হবে 'প্রাচ্য'—তার রীতিকর্ম, ইতিহাস, কলাসামগ্রী, ভূবৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব তার জাতিকুল সর্বস্ব নিয়ে। সেই থেকে পরিবর্তিত হয়েছে সংগ্রহশালার বিবর্তনের ইতিহাস। আদি পর্বে ইউরোপীয় উদ্যোগে এশিয়ার দেশবিদেশ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা শিল্পসম্ভার দিয়ে গড়ে তোলা হয় 'হাউজ অব কিউরিও সিটিজ', যা অক্ষয় কুমার দত্তের ভাষায় 'ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগার' বা কৌতুহল নিবাপনের কক্ষ বা ম্যাজিক চেম্বার বা আজবঘর অথবা যাদুঘর বা যেখানে যাদুবলে ঘুমিয়ে রয়েছে থরে থরে নিথর প্রাণসম্পদ। সম্পদ গড়ে তোলার সেই মধ্যযুগীয় ফিউডাল আগ্রহের পাশাপাশি উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সংগ্রহকে জনমনোরঞ্জক করে তোলার পরিকল্পনা। পথ খুলে যায় সাহেবদের সঙ্গে 'নেটিভ'দের মিউজিয়ামের সংগ্রহকর্মে অংশীদারী কাজে। ১৮৩২ সালেই অন্য পাঁচজন ভারতীয়ের সঙ্গে (মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মথুরানাথ মল্লিক, রাধাকান্ত দেব, শিবচন্দ্র দাস এবং বেগম সমরু) বাবু রামকমল সেন যাদুঘরে দানের সূত্রে খুঁজে আনেন বাঙলার নিজস্ব ব্রাত্য উৎসব চড়ক গাজনের ব্যবহার্য ১৬টি নৈমিত্তিক উপকরণ, এবং ৪১টি বাদ্যযন্ত্র। ভাবতে আশ্চর্য লাগে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেই যুগেই বাঙালীর এই কৃষ্টিদ্রব্য সংগৃহীত হয়েছিলো সেদিন যাদুঘরে রামকমলের একান্ত উদ্যোগে। এটা কি নবজাগরণের ফলশ্রুতি ? আজ আশ্চর্য শোনালেও এর পাঁচ বছর পরেই ব্রাহ্মীলিপির প্রধান পাঠক জেমস প্রিনসেপ সোসাইটির এই মিউজিয়ামকে 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম' বলে স্বীকৃতি দিতে সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করেছিলেন ২৭ জুলাই, ১৮৩৭-এ লেখা চিঠিতে। সোসাইটির লাইব্রেরীতে ইতিমধ্যেই ভারতীয়রা মেম্বার হয়েছেন। ১৮৩৩-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান হয়েছেন হেরম্বনাথ ঠাকুর। এর একত্রিশ বছর বাদে আরেক বাঙালী পূর্ণচন্দ্র বসাক অ্যাক্টিং কিউরেটর হন যাদুঘরের। এরই মধ্যে সোসাইটির কোলের সন্তান মিউজিয়ামের গায়ে লেগেছে ইমপিরিয়ালি জাঁক-জমক ও ইমপিরিয়ালি নাম। একটা বড় বাড়ি—একটা নিজস্ব প্রাসাদ তার

প্রয়োজন। ১৮৬৬-তেই, কী আশ্চর্য, যাদুঘরের নাম থেকে সাম্রাজ্যবাদী পরিচয়টুকু ঝেড়ে ফেলা হল। 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম'—ডাকা হল নতুন নামে।

নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানান্বেষণ। অনেকে মনে করেন উইলিয়াম জোন্স কালিদাসের 'শকুন্তলা' অনুবাদ করে জ্ঞানপিপাসুদের কাছে শুধু তাকে পুনরাবিষ্কারই করেন নি, কালিদাসকে মধ্যযুগীয় টীকাকারদের কবল থেকে উদ্ধার করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় নবজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সাহিত্যের উদ্ধারণে সহায়তা করেছিলো স্বসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক্ সোসাইটির লাইব্রেরি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই (১৮০০ খৃষ্টাব্দ) ছাত্র ও শিক্ষক ছাড়াও সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এখানকার লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগসুবিধে। শ্রীরামপুর মিশন লাইব্রেরিতে ঊনিশ শতকের গোড়া (১৮১৮) থেকেই সঞ্চিত হতে থাকে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বইপত্তর। কিন্তু যে গ্রন্থাগার কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে সেদিন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো সেটি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ মার্চ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। তার নাম ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি। সেদিনের কী ইংরেজ কী বাঙালী সকল বিশিষ্ট পাঠকই এই লাইব্রেরির সহায়তা নিয়েছেন অকৃপণভাবে।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে যেসব গ্রন্থাগার কলকাতার বাইরে স্থাপিত হয়েছিলো তার অন্যতম রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর (১৮৫১), হুগলি (১৮৫৪), কৃষ্ণনগর (১৮৫৬), কোন্নগর (১৮৫৮), উত্তরপাড়া (১৮৫৯), জনাই (১৮৬০), মাহেশ (১৮৬৯), চন্দননগর ও আড়িয়াদহ (১৮৭০)। জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা খুব কম নয়। কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরি এবং তালতলা পাবলিক লাইব্রেরির কথা মনে রেখেও বলতে হয় নতুন যুগের ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় এক বিশেষ ভূমিকা জুগিয়ে গিয়েছে ১৮৯৩ সালে গড়ে ওঠা বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

নানা কারণে গত শতকের শেষদিকে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ১৮৯৯ সালে মেটকাফ হলে লাইব্রেরির দুরবস্থা দেখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির নতুন তকমা এঁটে ১৯০৩ সালের ৩০ জানুয়ারী লর্ড কার্জন নব কলেবর দেওয়ালেন এই গ্রন্থাগারকে। তিনি বললেন, ছাত্ররা এখানে হয়ত অতীতের তথ্যাবলী খুঁজবেন, ব্যবসায়ী এবং রাজকর্মচারী বর্তমানের জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে নেবেন, আর কল্পনাবিলাসী বুদ্ধিজীবী এখানে ভবিষ্যতের গোপনগর্ভকে আবিষ্কার করতে আসবেন নিয়মিত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির জাতীয় চরিত্র তৈরি হল ১৯৪৮-এ। পরের চল্লিশ বছরে তবু অনেক পাঠকের ক্ষোভ,—গ্রন্থাগারটি সমগ্র জাতির 'আত্মার ঔষধাগার' (dispensary

of the soul) হয়ে উঠতে পারেনি এখনো। ১২৭৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে মিশরের এক গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে এই আকূতিই লেখা হয়েছিল একদিন।

আগেই বলেছি অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় চৌরঙ্গীতে বসে গিয়েছে নাট্য-লোকের আসর—চৌরঙ্গী থিয়েটার, চৌরঙ্গী ড্রামাটিক সোসাইটি। কিন্তু তারও আগে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আজকের রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পিছনের জমিতে গড়ে উঠেছিলো ক্যালকাটা থিয়েটার। সেখানে বেশ কিছু প্রহসন অভিনীত হত ১৮০৮ সাল অবধি। ওদিকে রাশিয়া থেকে এসে লেবেদেফ্ খুলেছেন সেই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দেই পুরোনো চীনাবাজার এলাকায় 'দুমতলায় বেঙ্গলি থিয়েটার' (Bengallie Theatre)। এখানেই প্রথম মঞ্চস্থ হল বাঙলা নাটক। ইংরেজী নাট্যচর্চার জবরদস্ত যুগে নতুন এক উপস্থাপন রীতি ও রসদ নিয়ে সাধারণ দর্শক সমাজের সঙ্গে নাট্যশালার সংযোগ স্থাপন করে দিলেন বাঙলা নাট্য-চিন্তার নবজাগরণের অগ্রদূত রুশী লেবেদেফ্। তবুও অষ্টাদশ শতকের প্রথম শতক থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কীর্তি ততটা প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল হতে পারে নি। সিপাহী বিদ্রোহের বছরটি থেকেই কলকাতায় নাট্য আন্দোলনের রমরমা শুরু হয়ে যায়। বহু শৌখীন নাট্যগোষ্ঠী তৈরী হয় শহরের নানা অঞ্চলে। ইংরেজী শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলের উৎসাহে বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থাপিত হয় ১৮৫৮ সালে। নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর নাট্যাবলী নিয়ে যুক্ত হন এই মঞ্চের সঙ্গে। বাংলা নাটকে একটি নতুন অভিনয়-ধারা প্রবর্তিত হয় এই সময় থেকেই।

নাট্যমঞ্চের ইতিহাস একটি নতুন দিগদর্শন করে ১৮৭২-এ যখন বাগবাজার ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন উৎসাহী পেশাদারী নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেন জাতীয় নাট্যশালার প্রবর্তন করে। বাংলা সাহিত্যে ও নাট্য-চর্চার ইতিহাসে এ এক যুগসন্ধিক্ষণ। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেদিন সাহিত্যের আঙিনায়; নতুন চিন্তা প্রসারে আর নাট্য আন্দোলনের মশাল সেদিন অ্যারিস্টোক্রেসির হাত থেকে সহসা নেমে এসেছে পেশাদার নাট্য কুশলীদের হাতে। হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গদর্শনের জাতীয়তাবাদী চিন্তা বিস্তারের ফলে যে সর্বাত্মক জাতীয় ভাবোদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছিল জনসমাজে, তারই ছবি ফুটে উঠেছিলো সেদিনকার নাটকে ও নাট্যশালায়।

শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্য কক্ষে চারু ও কারুকলায় নবজাগরণের অঙ্গীকার শুরু হয়েছিলো কবে থেকে সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে শিল্পকলার গবে-ষক কমল সরকার লিখছেন—'ভারতবর্ষ পুরোপুরি তখনও ইংরেজ দখলে আসেনি। গভর্নর জেনারেল হয়ে আসীন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রতীচ্যের আদর্শে কলকাতায় গড়ে উঠেছে হিন্দু কলেজ। কলেজের বয়স তখন চৌদ্দ। উইলিয়াম কেরী, ডেভিড্ হেয়ার, ড্রামণ্ড ও ডিরোজিও বেঁচে আছেন। বেঁচে আছেন রাজা

রামমোহন রায়ও ; তবে তিনি দেশে নেই, মাস তিনেক হল ইউরোপ রওনা হয়েছেন। রসময় দত্ত, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ প্রমুখ দেশহিতৈষীরা সকলেই আছেন কলকাতায়। হরকুমার, রমানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরও তখন কলকাতার মানুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন চোদ্দ বছরের কিশোর। বিদ্যাসাগর এগারো বছরের বালক।.....' এমনি এক পরিবেশে আয়োজন করা হয়েছিলো শহর কলকাতার প্রথম যৌথ চিত্র প্রদর্শনীর, ব্রাশ ক্লাবের উদ্যোগে ১৮৩১ সালের ১লা ফ্রেব্রুয়ারী টাউন হলে। টাউন হলের বয়স তখন বছর সতেরো-আঠারো। কলকাতার প্রথম যৌথ চিত্রপ্রদর্শনীতে সেদিন বিশ্বখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের নানা চিত্রকর্ম। সম্ভবত সেই প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা কোনো ছবি ছিলো না তবু ভারতীয় কলারসিকরা সংগৃহীত শিল্পকর্ম দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সে প্রদর্শনীতে এর উল্লেখ আছে তৎকালীন সংবাদপত্রে। ১৮৩২-এর ১৩-ই জানুয়ারী ব্রাশ ক্লাবের দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে তিনজন ভারতীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর, রঘুরাম গোস্বামী এবং শ্রীনাথ মল্লিক সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। দ্বারকানাথ বিখ্যাত প্রতিকৃতি-চিত্রকর জর্জ বিচির আঁকা রামমোহন রায়ের চিত্রটি দিয়েছিলেন প্রদর্শনীতে।

ব্রাশ ক্লাবের প্রথম দুটি প্রদর্শনীর সময় সংস্থার সম্পাদক ছিলেন উইলিয়াম কার—দ্বারকানাথ-সুহৃদ ও কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার। যে টাউন হলে কলকাতার প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, নবজাগরণের দিনগুলোর অনেক সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাক্ষী সেই পীঠভূমি। এবাড়িটি গড়ে উঠেছে লর্ড ওয়েলেসলির আমল থেকে লর্ড মিন্টোর সময়ে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারত-ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতনের স্মৃতি বহন করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান।

ফিরে আসা যাক এদেশের জাগরণ যুগের চিত্রচর্চায়। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলার এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ চারুকলা বিদ্যালয়েই শুরু হয়েছিলো—অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কাঠখোদাই, এচিং ও লিথোগ্রাফির অনুশীলন। এরপর ওই শতকের সাতের দশকে এই প্রতিষ্ঠান রূপ নেয় সরকারী আর্ট স্কুলে। ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি (১৮৮৯), দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রমোশন অব আর্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্যালারি (১৮৯২), বঙ্গীয় কলা সংসদ (১৯০৫), ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব আর্ট (১৯২০) হয়ে অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন্ আর্টস (১৯৩৩)-এ পৌঁছতে জাগরণের ধারা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে অবশেষে ক্ষীণতর হয়ে গিয়েছে !

বিগত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক উন্মেষের অংশীদার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে জ্ঞানান্বেষণ, বিদ্যাচর্চা, প্রকৃতি ও মানব ইতিহাসের প্রতি নিরন্তর জিজ্ঞাসা। মানবীয় সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ও নব নব দিগদর্শন ঘটে চলেছিলো

বাঁকে বাঁকে। তাদের সেই ধারাবাহিকতা কি আজো চলিষ্ণু না আবার উৎসমুখী ? উনিশ শতকের প্রায় সূচনা থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সব মূল্যবোধের উদ্ভব বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াস আমরা দেখেছি এইসব সাংস্কৃতিক সংস্থাকে কেন্দ্র করে তা সব বিনা বাধায় নির্দ্বন্দ্বে নির্বিরোধে সম্পন্ন হয় নি। পুনরুজ্জীবনের সেই পর্বে যে পরিবর্তন ও সংস্কারের ঢেউ এসেছিলো কৃষ্টির ক্ষেত্রে, চিন্তনের আধুনিকীকরণের যেউদ্যোগ আয়োজন চলেছিলো তা স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসছে বলে মনে করেছেন শিল্প ইতিহাসের আরেক মরমী বোদ্ধা ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—'বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাবিস্তার প্রয়াসে ভাঁটা পড়েছে'। উৎসাহ উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে আসছে···প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কুক্ষিগত হচ্ছে। শিষ্ট সংস্কৃতিপূত আচরণ শিক্ষিত সমাজ থেকে বিদায় নিচ্ছে। আর যারা রাষ্ট্রপ্রধান, সংস্কৃতির এই সংকটে তাঁরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক দাবা খেলার ঘুঁটিতে পরিণত করেছেন।' (সংস্কৃতির সংকট / ২০শে জানুয়ারী / ১৯৮০ বর্ধমান)

কার্ল মার্কস সেই ১৮৫৩ সালে একবার লিখেছিলেন, ইংরেজ ভারতের সমাজব্যবস্থার কাঠামোকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্ব ভারতকে তার সমগ্র অতীত ঐতিহ্য ও বিগত ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আর সে কোন্ শক্তি যা আজ পুনরুজ্জীবনের মুক্ত মানসিকতার সুফল থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে একালের প্রার্থীদের ?

বাংলা সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শক উইলিয়াম কেরী

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়*

॥ এক ॥

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস শুধু পন্ডিতের অনুসন্ধিৎসারই বিষয় নয়। সাধারণ পাঠকেরও কৌতূহলের বিষয়। আজ আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করি। সুন্দর করে ছাপান সংবাদপত্র আসে আমাদের হাতে। এই সুন্দর করে তোলার সাধনায় অনেকের চেষ্টায় তা' সম্ভব হয়েছে।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও বিকাশধারার ইতিহাসে ছাপাখানা এবং সংবাদপত্র প্রাণশক্তির মঞ্জুষা। বাংলা ভাষা ও সংবাদপত্রের ইতিহাসে কয়েকজন বৈদেশিক মহান পুরুষ বাঙ্গালী সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় রূপে পরম শ্রদ্ধেয়। তাঁদের মধ্যে এক মহান পুরুষের নাম পাদরী উইলিয়াম কেরী।

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ঃ 'বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত কয়েকজন বৈদেশিক পন্ডিত ও কর্মীর নাম যুক্ত হইয়া আছে। বাংলা-গদ্যের গঠনের প্রারম্ভে ইঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় কোন কালেই বিস্মৃত হইবার নহে। পর্তুগীজ প্রভাবের যুগে পাদরি মনাএল-দা-আসুসুম্পসাম্ এবং ইংরেজ প্রভাবের যুগে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনস্টোন, হেনরি পিটস ফরস্টার, জন টমাস ও উইলিয়াম কেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।..'

সজনীকান্ত দাস আরও উল্লেখ করেছেন ঃ 'উপরি-উক্ত বৈদেশিক পন্ডিত-সমাজে উইলিয়াম কেরী প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ ; বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য তাঁদের পরিশ্রমের তুলনা হয় না। দীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর কাল তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে ও উৎসাহে দেশীয় পন্ডিতেরা বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক রূপদান করিয়াছিলেন ; বাংলা-গদ্যের প্রথম যুগকে আমরা বিশেষভাবে উইলিয়ম কেরীর প্রভাবের যুগ বলিতে পারি।..'

পাদরী উইলিয়াম কেরী বাঙ্গালী জাতির জন্য যে কাজ করেছেন, তারজন্য আজও আমরা কৃতজ্ঞ! সজনীকান্ত দাস উল্লেখ করেছেন ঃ '...বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতি তাঁহার চেষ্টার ফলে লাভবান হইয়াছে এবং আমরা কৃতজ্ঞতা বশে তাঁহাকে তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান দিয়া আসিতেছি।'

---

* বিখ্যাত লোকতত্ত্ববিদ। দীর্ঘকাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯১ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক লোকবিদ্যায় অবদানের জন্য দীনেশ সেন পদকে ভূষিত হন।

পাদরী কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর কলকাতায় পদার্পণ করেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন মৃত্যুদিন পর্যন্ত (৪১ বৎসর) বাংলা ভাষা চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্র বহু মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম। কিন্তু এক সময় বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা বর্তমানের মতো ছিল না।

সজনীকান্ত দাস এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখ-যোগ্য। এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে ; যে ভাষা এতদিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ ও পাঠ্য পুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই খোঁড়া পায়ে দৌড় করানো হইল। উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগদর্শন' ও সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথম আপত্তি জানাইলেও পরে উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টি সাধনে যত্ন করিয়াছিলেন ; এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।'

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারীদের কলোনী থেকে বাংলা ভাষায় দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হয়। 'দিগ্‌দর্শন' ছিল মাসিক পত্রিকা। 'দিগ্‌দর্শন' প্রকাশ করার আগে পাদরী উইলিয়ম কেরীর সন্দেহ ছিল যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকরা হয়তো সংবাদপত্র কলকাতা থেকে বের করতে দেবেন না। দিলেও হয়তো, এই সংবাদপত্র নিয়ে একটা অপ্রীতির সৃষ্টি হবে। তখন শ্রীরামপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এলাকাভুক্ত ছিল না। শ্রীরামপুর তখন ওলন্দাজদের উপনিবেশ ছিল। পাদরী উইলিয়ম কেরী এবং তাঁর মিশনারী পরিজনদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এলাকায় বাস করার অনুমতি ছিল না। মাখনলাল সেন লিখেছেন ঃ

'এর দু'বছর পর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারীদের কলোনী থেকে বাংলা ভাষায় দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হয়, মাসিক পত্র হিসাবে। দিগ্‌দর্শন প্রকাশের পূর্বে ডক্টর উইলিয়ম কেরীর সন্দেহ ছিল যে,ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসকরা হয়ত দিগ্‌দর্শনকে কোলকাতায় প্রচারিত হতে দেবেন না। দিলেও হয়ত এই সংবাদপত্র নিয়ে একটা অপ্রীতির সৃষ্টি হবে। শ্রীরামপুর কোম্পানীর এলাকাভুক্ত ছিল না। ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল। আর ডক্টর কেরী প্রভৃতি ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের কোম্পানীর এলাকায় বাস করবার লাইসেন্সও ছিল না। কেরীর অমত সত্ত্বেও ডক্টর মার্শম্যান আর ওয়ার্ডের আগ্রহে দিগ্‌দর্শন প্রকাশিত হয়। দিগ্‌দর্শনের প্রচার কোম্পানীর এলাকায় নিষিদ্ধ হোল না দেখা গেল, তখন মার্শম্যান আর ওয়ার্ড সাপ্তাহিক সমাচার-দর্পণ প্রকাশ করলেন।...'

সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ঃ 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়।'

আমরা পাদরী উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর পরিজনদের পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো এই বলে যে, তাঁরা আমাদের দেশে এসেছিলেন, ঠিক অন্ধকার থেকে এ-দেশের অজ্ঞ মানুষকে অশিক্ষা, কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভেঙ্গে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে যাবার জন্য। তাঁরা ছিলেন পথ প্রদর্শক। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন ঃ 'অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ড থেকে যারা ভারতে এসেছিলেন তারা এসেছিলেন অবাধ লুণ্ঠনের এবং অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের প্রবল বাসনা নিয়ে। এই শতাব্দীর শেষ দিকে কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এই লুণ্ঠন ও বাণিজ্য সংগঠন করা হয়েছিল। দিনেমাররা এসেছিল ব্যবসা করতে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা ইংরেজ বণিকদের (Free Merchants) এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের বেনামী ব্যবসায় এজেন্ট হয়েই কাজ করত। কর্ণওয়ালিস থেকে বেণ্টিঙ্ক পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে, ১৭৯০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত, এই চার দশককে বলা যায় সাম্প্রাতক কালের অন্ধকার যুগ। সে সময় পুরোন সব ভেঙ্গে গিয়েছে এবং নূতন যুগের বিকাশের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না।

বাংলার এই দুর্গতির দিনে উপস্থিত হয়েছিলেন কেরী ও তাঁর পরিজন। তাঁরা কজনকে খ্রীষ্টান করেছিলেন তার পরিসংখ্যান আমাদের জানা নাই তবে এটা সকলেই জানেন যে, সে সংখ্যা তাঁদের নিকটে মোটেই উৎসাহজনক ছিল না। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমরা দেখতে পাই তা অন্য ধরনের – দেবতার এক নূতন প্রকাশ। যে অসাধারণত্ব আমরা এই কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে পাই তা অনুপ্রাণিত হয়েছিল অসামান্য প্রতিভা ও সহানুভূতি নিয়ে। কেরী ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন কর্মযোগী। তাঁদের সহযোগী ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, তারিণীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় পঞ্চানন কর্মকার, মনোহর কর্মকার প্রভৃতি নিরলস কর্মী। কেরী যুগের অসাধারণত্ব চিরস্মরণীয়। কোনও স্বর্ণযুগই চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু যে সূচনা হয়েছিল তা বাংলার নূতন ভাবধারাকে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল তা আমরা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারি।·· '

শক্তিব্রত ঘোষ লিখেছেন ঃ '···সাময়িক পত্র প্রকাশনায় তাঁর উদ্যোগ চরিতার্থ হয়, এবং এই উদ্যোগ চরিতার্থ হয়, এবং এই উদ্যোগ ঐতিহাসিক। ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া, দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ প্রকাশের পেছনে কেন্দ্রীয় শক্তি তিনি।···'

শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশনারীদের দ্বারা সংবাদপত্র বের হবার পরে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ-কৌমুদী' সাপ্তাহিক প্রকাশ

করেন। সংবাদ-কৌমুদীই বাঙ্গালীর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। সংবাদ-কৌমুদীতেই প্রথমে সামাজিক এবং রাজনীতিক সমস্যা নিয়ে লেখা ছাপা হয়েছিল। 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ (২০ অগ্রহায়ণ ১২২৮)। 'সংবাদ কৌমুদী'র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়ঃ

'সম্বাদ কৌমুদী'। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যে হেতুক দর্পণ বল কিংবা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের জ্ঞান সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট…।'

সমাচার দর্পণের উক্ত লেখা থেকে তৎকালীন শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহকর্মীদের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের অতুলনীয় কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উক্ত ছোট্ট লেখা যেন জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের কাজের ছোট্ট ভূমিকা। তাঁরা যে প্রয়াস নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তা বিস্ময়কর ভাবে সাফল্য লাভ করে। খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সেই অভিলাষ, কয়েকজনের পরিশ্রমে ও যত্নে সফলতা লাভ করেছিল।

'সংবাদ কৌমুদী' বের করেন কলুটোলার নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেনঃ

'নামে যিনিই সম্পাদক থাকুন 'সম্বাদ কৌমুদী'—সম্পাদনার ব্যাপারে যে রামমোহন রায়ের যথষ্ট হাত ছিল এবং তিনি যে পত্রিকাখানির সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।…'

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'অগত্যা রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার নামে ১৮২১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে **Brahmunical Magazine, The Missionary & the Brahmun No. 1** ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ মিসনরি সম্বাদ সং ১, 18 21'নামে একখানি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠা বাংলা ও পর-পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ থাকিত।

শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রকাশিত হইলেও রামমোহন রায়ই যে প্রকৃতপক্ষে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র লেখক একথার উল্লেখ রামমোহনের প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সমাচার চন্দ্রিকা'য় পাওয়া যায়।…'

শ্রীরামপুর মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরে বিভিন্ন ভাষায় অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ লিখেছেন,'

'কলকাতায় প্রথম মুদ্রাকর এবং ভারতের প্রথম সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকি তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য পাননি। কারণ, সরকার বাহাদুরের চোখে তিনি

ছিলেন অবাঞ্ছিত মানুষ,—শত্রুপক্ষ। অনেক মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে তাঁর ওই ছাপাখানার জন্য। হিকি স্বদেশে পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন না। মুদ্রাকর হিসাবেও তাঁর যে খুব অভিজ্ঞতা ছিল এমন নয়। তবু কলকাতায় কাগজ বের করেছিলেন তিনি তাঁর "মন এবং আত্মার স্বাধীনতার" জন্য। তাঁর কাগজ ছিল—"রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক"। প্রতিশ্রুতি ছিল—"সমস্ত দলের জন্য খোলা এর পাতা, কিন্তু প্রভাবিত নয় কারও দ্বারা"। প্রথম থেকেই "বেঙ্গল গেজেট" সরকারী কর্তাব্যক্তিদের সমালোচনায় মুখর। হিকির দুঃসাহসী কলমের সামনে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। হেস্টিংস, ইম্পে কেউ নন সমালোচনার ঊর্ধ্বে।...'

শ্রীপান্থ আরও লিখেছেন ঃ '...তারপর ক্রমে আসরে আবির্ভূত হল কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিলিত উদ্যোগে "সম্বাদ কৌমুদী" (১৮২১)। পরের বছর "সমাচার চন্দ্রিকা"। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রথম ফারসী, উর্দু, হিন্দী কাগজের আবির্ভাবও এই কলকাতায়। হিন্দীর প্রথম প্রকাশ অবশ্য কিছু পরে। "উদন্তমার্তণ্ড" প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০মে। কিন্তু হরিহর দত্তের উর্দু "জাম-ই-জাহান-নুমা" প্রকাশিত হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার প্রথম ফারসী কাগজ রামমোহন রায়ের "মিরাৎ-উল্-অখবার"—এর প্রকাশ ও একই বছরে।...'

আমাদের দেশে শ্রীরামপুর মিশনারীদের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁদের অতুলনীয় কৃতিত্বের কথা সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে থাকে। শ্রীপান্থ লিখেছেন ঃ '...ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি "দিগদর্শন"-এর প্রথম সংখ্যা কিনেছিলেন এক হাজার কপি। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাগজটির অন্তত ৬১, ২৫০ কপি কেনেন তাঁরা। "সমাচার দর্পণ"কে শিক্ষিত বাঙালীরা নাকি বলতেন "বয়স্ক স্কুল শিক্ষক",..."অ্যান অ্যাডালট স্কুল মাস্টার"। '১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রচার সংখ্যা সপ্তাহে ৪০০ কপি।...'"

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ 'কথাটি প্রথম বলেছিলেন ফ্রানসিস বেকন ঃ মুদ্রণযন্ত্র, বারুদ আর চুম্বক দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কারলাইল প্রায় তার প্রতিধ্বনি করে "চুম্বকের" স্থানে বসান প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতকে। আমাদের দেশে পাণ্ডুলিপির একচ্ছত্র রাজত্বে মুদ্রাযন্ত্রের পদক্ষেপ স্বভাবতঃই ঐতিহাসিক কারণে ছিল বিলম্বিত। বাংলা হরফের ধাতব রূপে আত্মপ্রকাশ হলহেডের ("হালদ ঙ্গ্রেজী") "এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ" (১৭৭৮) ছাপার সময় দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়োজনেই ঘটে। বইটিতে কৃত্তিবাসী "রামায়ণ", কাশীদাসী "মহাভারত" ও ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা ধাতব হরফের এই যোগাযোগ

সম্ভব করে তুলল বাংলা সাময়িক পত্র ও প্রকাশন-শিল্পকে।...'

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য আরও উল্লেখ করেছেন ঃ '...কাজেই শ্রীরামপুর মিশন বাংলা বই প্রকাশনের ক্ষেত্রে নেমেছিলেন প্রথমে, পরে বার করেন "দিগদর্শন" ও "সমাচার দর্পণ" (তাঁদের ছাপা "রামায়ণ-মহাভারতে"র হরফ পুঁথির হরফেরই অনুসরণ করেছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে।) এই "দিগ্‌দর্শন" ও "সমাচার দর্পণ"বাংলা ইতিহাসে অবশ্যই একটি যুগান্তর ঘটাল। "দিগদর্শন অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে প্রকাশিত প্রথম বাংলা মাসিক পত্র। '

অধ্যাপক ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন ঃ '...খ্রীষ্টধর্মের মহিমা ও পরধর্মের নিন্দা প্রচার এর উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হত বলেই স্কুল বুক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮১৭) এই পত্রিকাটির সমাদর করতেন।

"সমাচার দর্পণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে ফেলিক্স কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের পরিচালনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে দেখা দেয়। এই পত্রিকা জন্মকাল থেকেই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল, কিন্তু কোম্পানীর কোনো কোনো কাজের সমালোচনায় তার কন্ঠ নীরব থাকেনি। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য স্বরূপ বলা হয়েছিল ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমাচার, ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা এবং ইউরোপে মুদ্রিত নতুন জ্ঞানগর্ভ বইগুলি থেকে আহৃত তথ্যাদি ছাপানো হবে। এর উদ্দেশ্য বহুলাংশে কার্যে রূপায়িত হয়েছিল।"

পাদরী উইলিয়াম কেরী এবং তাঁর সহকর্মীরা নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমত্ববোধেই শ্রীরামপুর মিশনের কাজ শুরু করেছিলেন। পাদরী উইলিয়াম কেরী একজন নিঃস্ব মানুষ হিসাবে এ-দেশে এসেছিলেন। বারে বারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। চাকরিও নিয়েছিলেন নীলকুঠিতে। ধর্মপ্রাণ মহান মানবদরদী দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও ভেঙ্গে পড়েননি। তাঁর জীবনে নানারকম দুঃখ-বেদনার মধ্যেও কাজ করে গেছেন।

॥ দুই ॥

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হবে শ্রীরামপুর মিশনের কথা। সংবাদপত্র যোগসূত্র রূপে অনেকের সামনে তুলে ধরে বিভিন্ন বার্তা। মানুষের অভাব-অভিযোগ, স্বৈরাচারীর কথা তুলে ধরতে পারে জনগণের সামনে। সংবাদপত্রের আর এক নাম শক্তি। আমাদের দেশে শ্রীরামপুর মিশনের মতো অন্যান্য আরও কয়েকটি খ্রীষ্টীয় ধর্মের পাদরী ক্ষুদ্র সংবাদপত্র বের করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হলো :

১. **উপদেশক** (মাসিক)। জানুয়ারি ১৮৪৭ সাল। 'উপদেশক'—সম্পাদন করতেন, পাদরী জে. ওয়েঙ্গার। এই মাসিক পত্রিকা ১৮৫৭ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পত্রিকায় ১৮৫৩ সালের একটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল ঃ 'খাড়ি গ্রামে ওলাউঠা' সংবাদ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ 'মার্ডক লিখিয়াছেন, ১৮৫৭ সন পর্যন্ত "উপদেশক" পরিচালন করিয়া সম্পাদক স্বদেশে গমন করেন ; ১৮৬৩ সনে এ-দেশে ফিরিয়া তিনি "উপদেশক"কে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সনে ইহা লুপ্ত হয়।

২. **সত্যপ্রদীপ** (সাপ্তাহিক) ৪মে ১৮৫০ শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে ছাপা হতো। প্রকাশক : মেরিডিথ টৌন্সেন্ড।

৩. **সত্যার্ণব** (মাসিক) জুলাই ১৮৫০। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লেখেন ঃ '...অদ্যাবধি মাসে ২ "সত্যার্ণব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিব। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম সভার কএক জন যাজক এই পত্রের অধ্যক্ষতা করিবেন, তাঁহাদের অভিমতানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক, তবে কার্য্যের সুগমার্থ এক জনের প্রতি সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হইবেক।...'

'সত্যার্ণব' ১৪৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে 'বিদ্যাকল্পদ্রুম যন্ত্রে' ছাপা হতো। সত্যার্ণব সম্পাদন করতেন ঃ পাদরী জে. লং।

৪. **খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি** (মাসিক) মে ১৮২২ শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন ঃ আনন্দ খ্রীষ্টীয়ানের চরিত্র, দেশ ভ্রমণের বিবরণ ও মঙ্গল সমাচার প্রাপ্তির বিবরণ।

চিঠির সারাংশ। চট্টগ্রাম হইতে জোহান্স সাহেবের লেখা।

দিল্লী হতে তাম্‌সন্‌ সাহেবের লেখা। দিনাজপুর হতে নিধিরাম খ্রীষ্টীয়ানের লেখা।

সুজনপুর হইতে ডগলিস সাহেবের পত্র। দক্ষিণ সমুদ্র উপদ্বীপ। পৃথিবীর মনুষ্যদিগের বিষয়। বেথেল নামে জাহাজীয় লোকেদের সম্প্রদায়।

শ্রীরামপুরের সহমরণ সংবাদ। বর্তমানেও শ্রীরামপুরের সহমরণ সংবাদ একটি জঘণ্যতম ঘটনা রূপে আলোচনার বিষয়।

৫. **সত্যপ্রদীপ** (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬০। 'সত্যপ্রদীপ' ছিল শিশু-পাঠ্য পত্র। ইহার প্রকাশক : খ্রীষ্টান্‌ ভার্নাকিউলার এডুকেশন সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যপ্রদীপ' ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার সেকালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দ্বারা আরও অনেক বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

॥ তিন ॥

ছাপাখানার ইতিহাসের সঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সেকালের ছাপা খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলা বই। কয়েকটি বই-এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো :

১. **খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা** (ইং ১৮৫১ সালে প্রকাশিত)। প্রকাশক ঃ কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, ১২৬ পৃষ্ঠা।

২. **খ্রীষ্টের উপাখ্যান ঃ জগত্তারক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র বর্ণন।** কলিকাতা, Christian Tract & Book Society, ১৮৪০, পৃষ্ঠা ৩৬।

৩. **জগতের ত্রাণকর্তার উপাখ্যান** কলকাতা থেকে হিন্দুস্থানী ছাপাখানায় মিঃ ফিলিপ নেরোরা সাহেব কর্তৃক ১৮১৮ সালে ছাপা হয়।

৪. **দয়ানন্দ সরস্বতী—দাউদের গীত** শ্রীরামপুর, ১৮০৩।

৫. **দাউদের গীত**, Calcutta, Bible Society, ১৮৩৮।

৬. **ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ** অর্থাৎ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের···সুসমাচার এবং প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণ ও উপদেশাদির ও ভবিষ্যদ্বাক্যের পত্র। কলিকাতা, ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস, ১৮৪১।

৭. **ধর্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসোত্তর** ২য় খণ্ড, Calcutta, Christian Tract and Book Society, ১৮৩৯।

৮ **মাতা ও কন্যার পরস্পর কথোপকথন।** ৪র্থ সং। কলিকাতা, Christian Tract and Book Society, ১৮৩৮, ২৪ পৃষ্ঠা।

৯. **যুবকের ইতিহাস।** কলিকাতা, Christian Tract & Book Society, ১৮৪২, ৫১ পৃষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সেকালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রকাশিত বই অনেক স্কুলে পড়ানো হতো।

১০. **সদাচার দীপক অর্থাৎ** ধর্ম ও নীতি বিষয়ক ইতিহাস। কলিকাতা, Christian Tract & Book Society। ১৮৩৬, ৪৮ পৃষ্ঠা।

১১. **সলোমন, হিতোপদেশ সংগ্রহ** Calcutta, Auxiliary Bible Society, By Rev. W. Morton, 1843, পৃষ্ঠা ৭৬.

সেকালে খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা শুধু ধর্মের বই বের করেন নি। তাঁরা সমাজের মঙ্গলের জন্য, জনশিক্ষার জন্য, বিজ্ঞান চর্চার জন্য বইও বের করেছিলেন। যেমন ঃ

১. **মদ্যপানের প্রতিফল।** কলিকাতা ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৪২, ২২ পৃষ্ঠা।

২. **জন মাক, কিমিয়াবিদ্যার সার** (জন মাক সাহেব) কর্তৃক

হইয়া গৌড়ীয় ভাষায় অনূদিত। ১ম খণ্ড মূলসহ। শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৩৪, ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

পরিশেষে ফিরে আসা যাক আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় পাদরী উইলিয়াম কেরী। তাঁকে স্মরণ করার সময় অবশ্য উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র, মুদ্রিত বই, কাগজ, ছাপার কালি প্রভৃতি বিষয়ের কথা এসে যায়। পাদরী কেরীর শ্রীরামপুরের ছাপাখানা ভারতবর্ষের ছাপাখানার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য প্রেস। এই মিশন প্রেসের কর্মীদের মধ্যে অনেকে ছিলেন, যাঁরা সেদিন জানতেন অনেকগুলি ভাষা। অনেকে ছিলেন যাঁরা গ্রীক, হিব্রু, আরবী, সংস্কৃত, ফার্সি বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা, মারাঠি, আর্মেনিয়ান, চীনা, প্রভৃতি ভাষা বলতে এবং পড়তে পারতেন। বাইবেল ছেপেছিলেন ৩১ ভাষায়। শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস ১৮০১ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ ভাষায়, হাজার হাজার বই ছেপে এক ইতিহাস রচনা করেন। এই কারণে কেরী, মার্শম্যান এবং ওয়র্ড সাহেবকে ভারতের ছাপাখানার জনক বলা হয়।

শ্রীরামপুর প্রেস ভারতে প্রথম ষ্টীম ইঞ্জিন-এর ব্যবহার শুরু করেছিল। আধুনিক ভাবে কাগজ তৈরি করার 'পেপার মিল' স্থাপন করেছিলেন তাঁরা। একদল বিশ্বের মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ শুরু করেছিলেন আরও অনেক কাজ। যেমন ঃ ছাপাখানার জন্য কালি তৈরি। ১৮০৯ থেকে কাগজ তৈরি শুরু হয়। উন্নতমানের মণ্ড এবং কীটনাশক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য শ্রীরামপুর মিশনে দীর্ঘদিন গবেষণার কাজও শুরু হয়েছিল।

ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবর্তনের পথিকৃৎ এই শ্রীরামপুরের মিশনারী-দের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সময়ও তাঁদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করলে ঊনিশ শতকের ইতিহাস চর্চা সম্পূর্ণ হবে না।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সজনীকান্ত দাস, উইলিয়াম কেরী।
২. অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ভূমিকা, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর পরিজন,
৩. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্ব উল্লিখিত গ্রন্থ,
৪. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, মিশন প্রেস ঃ শ্রীরামপর, দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৫. শ্রীপান্থ, তলোয়ার বনাম কলম ঃ প্রথম শতবর্ষে, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায় সম্পাদিত—পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ,

৬. দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা সাময়িকপত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থ,
৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক পত্র,
৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা,
৯. মাখনলাল সেন—স্বাধীন রাষ্ট্রে সংবাদপত্র,
১০. শক্তিব্রত ঘোষ—উইলিয়াম কেরী সাহিত্য সাধনা,
১১. B. S. Kesavan, The glory that the printed word was and could be,—Indian Libraries : Trends and Perspectives, Edited by K. M. George,
১২. Atul Chandra Gupta—Studies in the Bengal Renaissance.

ডঃ উইলিয়াম কেরী ঃ একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

সঞ্জীব সরকার*

যে কয়জন মহানুভব বিদেশী পুরুষ আমাদের দেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন, ডক্টর উইলিয়াম কেরী তাদের মধ্যে একটি অগ্রগণ্য নাম।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বছর বয়সে কেরী এদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন, তারপর সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর তিনি জীবনযাপন করেছেন, কখনো ইংল্যাণ্ডে ফেরার নাম করেন নি। তার সমগ্র জীবন প্রকৃতই এদেশের সেবায় ছিল নিয়োজিত। 'My heart is wedded to India' তার এই উক্তি নেহাৎ কথার কথা নয়, তার অন্তর থেকে উঠে আসা ভারত ও ভারতবাসীর প্রতি ভালবাসার চূড়ান্ত নিদর্শন।

কেরী সাহেব যখন বঙ্গদেশে আসেন, তখন ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন চলছে। শাসন না বলে শোষণ বলাই সঙ্গত। এ দেশে এসে ইংরেজ বণিকের দল দস্যুর মত লুণ্ঠন করে দিয়ে যাচ্ছে আর এদেশের মানুষের ভাগ্যে নেমে আসছে চূড়ান্ত নির্যাতন ও দারিদ্র্যের অভিশাপ।

বিদেশী বণিক শাসকের প্রসাদপুষ্ট দেশীয় সামন্তও বণিকবর্গ অপরিমিত বিলাসব্যসনে দিন কাটায় আর সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে চলে ছিনিমিনি খেলা। এই ছিল অবস্থা। ধর্মের নামে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নামে তখন চলত অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, বহুবিবাহ, স্ত্রীজাতির উপর নিষ্ঠুরতা এসব তো ছিলই, তাছাড়া ছিল আরও নানা নিষ্ঠুর প্রথা, যেমন সতীদাহ, শিশুহত্যা, কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া ইত্যাদি। সারা দেশে একদিকে ছিল চরম অর্থনৈতিক শোষণ, আরেকদিকে ছিল সামাজিক কুসংস্কার ও রীতিনীতির অচলায়তন।

ইংরেজ বণিক এ অবস্থায় পরিবর্তন কামনা করত না। ধুরন্ধর শোষকরা জানত, এ অবস্থাই তাঁদের অবাধ লুণ্ঠনের পক্ষে প্রশস্ত। আফিমের নেশায় যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের না জাগানো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল।

এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখলে আমরা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের মিশনারী কার্যকলাপের বিরোধিতার অন্তর্নিহিত কারণ অনুধাবন করতে পারব। প্রথম দিকে কোম্পানীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—তাদের অধিকৃত রাজ্যে মিশনারীরা প্রবেশ করতে পারবে না। ধর্মীয় ও সামাজিক যে অবস্থা তখন বিরাজ করছিল

---

* সঞ্জীব সরকার একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ এবং সি. সি. সি. এ-র ডিরেক্টর॥

তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের চেষ্টার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে সংঘর্ষের সূত্রপাত হতে পারে এই আশঙ্কায় সর্বদাই কর্মকর্তারা সশঙ্কিত ছিল।

ইতিপূর্বে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জন মার্শম্যান এবং আরও দুজন মিশনারী কোম্পানীর রাজত্বে বাসের সুযোগ না পেয়ে ডেনমার্করাজের অধীন শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেরী সাহেব ছিলেন মদনবাটিতে নীলকুঠির অধ্যক্ষ হিসাবে। তিনিও তখন সেখান থেকে চলে আসেন, শ্রীরামপুরে তাদের সঙ্গে মিলিত হন।

কোম্পানীর কর্তারা চুপ করে থাকবার পাত্র নয়। তারা ডেনমার্ক প্রতিনিধি কর্নেল বী-কে লিখে পাঠালেন 'যে কয়জন ইংরেজ মিশনারী আমাদের বিনা অনুমতিতে বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিয়েছে তাদের অবিলম্বে কলকাতায় প্রেরণ করুন।'—

কর্ণেল বী কিন্তু ওদের কথায় কান দিলেন না। এইভাবে শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব ও তার সহকর্মীদের কর্মকেন্দ্রের পত্তন হোল। সেটা ১৮০০ সাল।

কিন্তু কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজ মিশনারীদের বিরোধ এর পরেও বিভিন্ন ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বিরোধ চরমে ওঠে ১৮০৬-০৭ সালে যখন লর্ড মিণ্টো গভর্ণর জেনারেল হয়ে কলকাতায় এলেন। ইতিপূর্বে ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে, এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা এই সমস্ত অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্যে দায়ী করলেন কেরী সাহেব ও অন্যান্য মিশনারীদের। কোম্পানীর অমানুষিক শোষণ ও লুণ্ঠন নয়, দায়ী করা হোল কয়েকটি নিরীহ ধর্মযাজকের প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার!!

বিলেতে পর্যন্ত পাদ্রী কেরীর কার্যকলাপ নিয়ে তোলপাড় আরম্ভ হোল। কয়েকজন অতি উৎসাহী ইংরেজ কেরীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রকাশ করতে লাগলেন। এবং অবিলম্বে এই সব নির্বোধদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার দাবি তুললেন। মিঃ টুইনি নামক এক ধুরন্ধর সাম্রাজ্যবাদ ভক্ত লিখলেন 'if a society having such object did exist, then our possession in east were already in a situation of the most imminent and unprecented peril and no less a danger than the threatened extermination of our Eastarn Sovereignty, commanded us to step forward and arrest the progress of such rash and unprecedented proceedings." (History of Serampur Mission, vol. I, page 334)

খ্রীষ্টের প্রেমের রাজ্যের বিনিময়ে ইংরেজ তার সাম্রাজ্য হারাতে রাজী নয়। সুতরাং কেরী ও তার সহকর্মীদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হোল। কোম্পানীর রাজত্বে তাদের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হোল এবং শ্রীরামপুর প্রেস বাজেয়াপ্ত করার

হুকুম জারী হোল।

অবস্থা এতোদূর সংকটজনক হয়েছিল যে, শ্রীরামপুরে আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত রেখেই কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হোত।

পাঁচ ছ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে প্রেস তারা গড়ে তুলেছিলেন এবং সে প্রেসে বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কঙ্কণী ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও অন্যান্য পুস্তক মুদ্রিত হচ্ছিল, সেই ছাপাখানা যদি সেই সময় বণিকরাজের হাতে চলে যেত, তাহলে কেরী সাহেবের অনেক মূল্যবান কাজই রয়ে যেত অসমাপ্ত। কোম্পানীর এই অযৌক্তিক আদেশে তারা উদ্বিগ্ন হলেও বিমূঢ় হন নি, স্থিরমস্তিষ্কে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। অনেক বিবেচনার পর কেরী ও মার্শম্যান তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সমস্ত বিষয় আলোচনা করেন। সুখের বিষয় এই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়, শ্রীরামপুর মিশনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

বাংলা গদ্যের আদিপর্ব

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কেরী সাহেব ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই কলেজে বাংলাভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে বাংলা গদ্য পুস্তকের একান্ত অভাব অনুভূত হয়। কেরী সাহেব স্বয়ং বাংলা গদ্য পুস্তক রচনায় অগ্রণী হলেন এবং তার মুন্সী রামনাম বসুকে দিয়ে লিখালেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য'! ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই এটি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থটিকেই বলা যায় বাংলাভাষার আদি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কেরী প্রণীত 'কথোপকথন' পুস্তকটিও এই সময় প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে হ্যালহেড সাহেব 'বাংলা ব্যাকরণ' প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা সময়োপযোগী বিবেচিত না হওয়ায় কেরী সাহেব স্বয়ং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করলেন।

কেরী সাহেব বাংলাভাষাকে ঐশ্বর্যশালী এবং গদ্য সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে সারাজীবন পরিশ্রম করেছেন সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় পণ্ডিতসমাজকেও উৎসাহিত করেছেন বাংলাসাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হতে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁর নিজস্ব পণ্ডিতবর্গ অনেকগুলি বাংলাগ্রন্থ রচনা করেন।

'কথোপকথন' পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন—'বাংলা ভাষার যদি যথারীতি অনুশীলন হয় তবে তা প্রাঞ্জলতায় ও সৌকর্যে কারো চেয়ে নিকৃষ্ট হবে না।'

অনুশীলনের সূত্রপাত স্বয়ং তিনিই করেছেন তাঁর দ্বারাই স্থাপিত হয়েছে বাংলাসাহিত্যের ভিত্তি। পরবর্তী যুগে বাংলাসাহিত্যে যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়, তার জন্য বাংলা সাহিত্য কেরী সাহেবের কাছে ঋণী'।

কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' এবং 'ইতিহাসমালার গল্প' (১৮১২) এই

পুস্তক দুখানির মধ্যে বাংলা বাকরীতি ও মৌলিক রচনা ভঙ্গীর যে আশ্চর্য নমুনা পাওয়া যায়, তাতে তার এই ভাষার উপর যথেষ্ট দখলের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিদেশী হয়েও তিনি বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ ভঙ্গীকে পর্যন্ত আয়ত্ত করেছিলেন। অনেকে অবশ্য এই পুস্তক দুখানি প্রকৃতই তাঁর রচনা কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। একথা স্বীকার করতে হবে, সুদক্ষ মুন্সীর সহায়তা ভিন্ন এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিজেকে পুস্তক দুখানির 'রচয়িতা' বলে জাহির করেন নি। লোকমুখের ভাষা ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের কথাবার্তা সংগ্রহ করে তিনি 'কথোপকথন' পুস্তক সংকলন করেন। কল্পনাশক্তির পরিচয় দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়, কথোপকথনের ভাষার নমুনা তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তখনকার প্রচলিত কথাবার্তা হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কথাবার্তার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও মানুষের বাস্তব চিত্র ফুটে বেরিয়েছে। এই বাস্তবতা অনেক সময় এতো নগ্ন যে তা দুয়েক জায়গায় মনে হয় যেন শ্লীলতার সীমা লংঘণ করেছে।—'কথোপকথন' পুস্তকে আমরা পাই নানা ধরণের লোকের কথা, পাই খানসামা, ধান চাষী, মহাজন, ভূমিহীন চাষী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কলহপরায়না রমণী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাও চরিত্রের সাক্ষাৎ। তাদের নিজস্ব ঢঙের কথা শুনি। তাঁদের সংলাপ এতো জীবন্ত যে তার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের চরিত্র ফুটে ওঠে। সেই সঙ্গে সেকালে প্রচলিত সংস্কার ও শোষণের রূপ রেখাও ফোটে। একটি উদাহরণ দেই ঃ

—শুন, তুই সুদ সুদ্ধ আমার টাকা ফেরৎ দে, না দিলে তোকে পেয়াদা দিব।

—শুন মহাশয় জোড় হাতে নিবেদন করি, কিস্তিবন্দী করিয়া মাসে মাসে এক টাকা শোধ করিনু। তাহার কড়ার লিখিয়াদি। —তোর বলদ গাই গোটা চারেক বেচিয়া টাকা শোধ কর আরকি।—মহাশয়, তুই মাবাপ। তোমার চরণ ছাড়িনু না। মহাশয়, আপনি বিবেচনা করুন, হাল-গরু বিক্রি করিলে চাষ কেমন করিয়া চলিবে ?"—(কথোপকথন)—

'ইতিহাস মালার গল্প' ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। দীর্ঘ ১২ বছরের অভিজ্ঞতা ও ভাষাচর্চার ফসল এই গল্প সংকলন। এর গদ্যরীতি অনেক সুসম্পন্ন ও উন্নত। এই পুস্তকে ১৫০টি লোক কাহিনী স্থান পেয়েছে। লোক মুখে প্রচলিত গল্প যেমন আছে তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষার ভান্ডার থেকে গৃহীত কাহিনীও এতে আছে। বাংলাভাষা যেন এই প্রথম তার নিজস্ব রীতি ও গতি এই গদ্য রচনার মধ্যে লাভ করেছে। বলা চলে বাংলার লোক সাহিত্য ও লোক কথাকে তিনিই প্রথম মর্যাদা সহকারে জন সমক্ষে উপস্থিত করেন।

বহুমুখী কর্মসাধনা

কেবলমাত্র বাংলাভাষার জন্যেই যে কেরী সাহেব পরিশ্রম করেছেন তা নয়, ভারতের বিভিন্ন ভাষা তার সেবায় সমৃদ্ধ হয়েছে। পাঞ্জাবী, তেলেগু ইত্যাদি পাঁচটি ভাষায় ব্যাকরণ ও তিনটি ভাষায় তিনি অভিধান প্রণয়ন করেন। তিন খণ্ডে তিনি দুই হাজার পৃষ্ঠার ৮০ হাজার শব্দ বিশিষ্ট বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। তারই উৎসাহে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ' মুদ্রিত হয়।

কেরী সাহেব স্বয়ং সংস্কৃত, বাংলা প্রভৃতি ২৪টি ভাষায় সমগ্র বাইবেল তর্জমা করেন। মূল বাল্মিকী রামায়ণ তিনি এবং মার্শম্যান ইংরেজীতে তর্জমা করেন এবং তিনখণ্ডে তা প্রকাশিত হয় (১৮০৬-১০)

বিভিন্ন ভাষায় কেরীসাহেবের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সর্বযুগের একজন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত হিসাবে অভিহিত করা যায়।

বঙ্গদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেও মহাত্মা কেরী ও মার্শম্যানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইউরোপীয় ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ান বালকবালিকাদের জন্যে তাঁরা শ্রীরামপুর এবং কলিকাতায় কয়েকটি দৈনিক ও বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করেন। শ্রীরামপুরের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লোকদের জন্যে অনেকগুলি অবৈতনিক স্কুল ও পাঠশালা তারা পরিচালনা করতেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস মার্শম্যানের উদ্যোগে কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা শুরু হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড এশিয়া মহাদেশের খ্রীষ্টান ও অন্যান্য তরুণ বয়স্কদিগকে "প্রাচ্য সাহিত্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা প্রদানার্থে" শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপনের ঘোষণা করেন। ১৯ জন খ্রীষ্টান ও ১৮ জন হিন্দু ছাত্র নিয়ে শ্রীরামপুর কলেজ এর উদ্বোধন হয় ১৮২১ খ্রীঃ।

শ্রীরামপুর কলেজের থিয়োলজী বিভাগ স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত। এখানে থিয়োলজীর বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়।

এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশেও কেরী ও তার সহকর্মীবৃন্দ ছিলেন অগ্রদূত। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'দিগদর্শন' নামে একটি বাংলা মাসিক এবং 'সমাচারদর্পণ' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রের সূচনা করেন। উক্ত বৎসরেই The Friend of India নামে ১টি মাসিক পত্র বের হতে আরম্ভ করে। এই মাসিক পরে পাক্ষিক এবং অবশেষে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' কাগজের সঙ্গে যুক্ত হয়।

কেরী ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসে-ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মিশনারীদের সঙ্গে তাদের এক পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেরীর গভীর মানব প্রেম, এবং এই দেশের কল্যাণ সাধনের জন্যে তাঁর অক্লান্ত সাধনা তাঁকে সমস্ত প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্ধ্বে উপনীত করেছিল। তিনি নিছক ধর্মপ্রচারক নন, মহান সংগঠক ও সমাজ সংস্কারক ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উদগাতাও বটে।

বাংলার নবজাগরণে উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা

কিরীটি গুপ্ত*

ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে একটি দেশের আর্থ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাত সেই জাতির ভাবজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তা থেকেই এক নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সন্ধিকাল হিসেবে আমরা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দকে ধরতে পারি।

১৭৯৩ খ্রীঃ--এর দুটি ঘটনা বাংলার জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। উইলিয়াম কেরী খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য কোলকাতায় আসেন ১৭৯৩ সালে। আবার ঐ সালেই বাংলা দেশের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোড চালু করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পেছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের মূল আরও সুদূর প্রসারী করা। কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চালু হয়েছিল এই আইন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের জমি কেনা-বেচা, দান-বন্ধক দেবার আইন চালু হলে মধ্যস্বত্বভোগের একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হল। তারা আবার ছোট বড় বিভিন্ন শ্রেণীর পত্তনিদার সৃষ্টি করে। এরা অনুপস্থিত জমিদার হিসেবে শাসন ও শোষণ কার্য চালাতো।

নবাবী আমল শেষ হলেও নবাবী সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছিল বাবু সংস্কৃতিতে। বনেদিয়ানাহীন মধ্যস্বত্বভোগী এই জমিদাররা লোকচক্ষে সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ছেলেমেয়েদের বিয়েতে, বাবা বা মায়ের শ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন, বিড়ালের বিয়ে নিতেন জাঁকজমক সহকারে। সন্ধ্যাকালে কুরুচিপূর্ণ বিলাসব্যসনে কুৎসিত আমোদ প্রমোদে অজস্র টাকা ব্যয় করতেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে আয়করা সম্পদে ধনবান ভূস্বামী শ্রেণীর একটি অংশই আবার এই দেশে বিশেষ করে এই শহরে নিয়ে আসে এক সাংস্কৃতিক নব-জাগরণ। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সমাজের বিভিন্ন কু-প্রথা ও কুআচারের অবসান-কল্পে এরা আন্দোলন শুরু করেন। আধুনিক শিক্ষা চালু করার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার করার আন্দোলনে এরা নেতৃত্ব দেন।

---

* শ্রী কিরীটি গুপ্ত একজন প্রথিতযশা শিক্ষক ও গবেষক।

দেশীয় জনসাধারণকে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঊনবিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। তাদের শাসনকালের প্রথম দিকে এদেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

প্রাথমিক শ্রেণী আর উচ্চশ্রেণী। প্রাথমিক শ্রেণী দুরকম ছিল। পাঠশালা আর মকতব। গ্রাম্য পাঠশালায়—বাংলায় লেখা, অংক ও শুভংকরী শেখান হত। মকতবে—উর্দু-ফারসি, সাধারণ হিসাব ও গণিত পড়ান হত। আরবি কোরাণের খানিকটা অংশও মুখস্ত করানো হত। সাধারণত স্বল্পবিত্ত জমিদার, ব্যবসায়ী এবং অবস্থাপন্ন চাষীদের ছেলেরাই এগুলি পড়তে আসত। উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দুদের টোল, চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানদের মাদ্রাসা ছিল।

এদিকে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার জন্য আঠারো শতকের কোলকাতার বাবুরা কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ শিখে সহজে অর্থ উপার্জনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের নবজাগরণের নায়করা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আগ্রহী ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তরুণ ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে বিনা অনুমতিতে ইংল্যাণ্ড থেকে শিক্ষক বা মিশনারীরা প্রবেশ করতে পারত না।

কোম্পানীর অনুমতি ছাড়াই উইলিয়াম কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় আসেন, সাধারণ প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে প্রথমদিকে কোম্পানীর অনীহা ছিল। তাই প্রায় ৭ বছর কেরীকে ব্যাণ্ডেল, নদীয়া, সুন্দরবন, মালদহ প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। ধর্মপ্রচারের সংকল্প নিয়ে এদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে এসে দেশীয় ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁকে দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলে। তখনকার দিনের বাংলা ছিল সংস্কৃত, আরবি ফারসি শব্দবহুল, অথবা তৎসম, তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্যযুক্ত বাংলা। কেরী সেই বাংলা ভাষাকে ব্যাকরণ শব্দকোষ স্থির করে, আরবি ফারসির লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করে সংহত করার কাজে মন দিলেন। ফলস্বরূপ আমরা পেলাম ইংরাজীতে লেখা কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, ভাষা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুশৃঙ্খল পদ্ধতি গঠন করলেন কেরী ভাষা বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে। বাংলা ভাষাকে তাঁর শৈশব কাল থেকে উত্তীর্ণ হতে যা প্রভূত সাহায্য করেছিল। ১৮১৫ থেকে ১৮২৫ সালের মধ্যে কেরী রচনা করলেন বাংলা-ইংরাজী অভিধান

এবং "A Universal Dictionary of Oriental Language" নামক সংস্কৃত ভাষা সহ ১৩টি ভারতীয় ভাষায় সম্বলিত শব্দকোষ। আজ আমরা যে পরিশীলিত বাংলা পাচ্ছি তার পেছনে আছে এই মহান বিদেশীর অসামান্য অবদান।

১৭৯৮ সালে বাংলা মুদ্রণের জন্য মুদ্রণযন্ত্র তৈরী হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ১৮০০ খৃঃ। মার্সম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি ইংরেজ মিশনারীদের সাহায্যে কেরীর অধিনায়কত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এলেন। এই পরিকল্পনার পেছনে মাতৃভাষার মাধ্যমে খৃষ্টধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্য থাকলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়ম কেরী তাতে যোগ দেন। কেরীর উৎসাহে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরা ইংরেজ ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা শুরু করেন। এই সব শিক্ষকদের মধ্যে রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রামরাম বসু 'জন টমাস' এবং কেরীর মুনসি হিসেবে কাজ করেন। কেরী তাঁর কাছ থেকে বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শেখেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন উইলিয়াম কেরীর মাধ্যমে।

সম্ভবত মালদহে থাকার সময় মৃত্যুঞ্জর বিদ্যালংকারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শুনে কেরী তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকেই তাকে পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ করেন।

কেরীর নেতৃত্বে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতি লেখকমণ্ডলী বাংলা গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দেন।

উইলিয়ম কেরী লেখেন—কথোপকথন (১৮০১), বাংলা ব্যাকরণ (১৮০১) ইতিহাসমালা—(১৮১২) বাংলা-ইংরাজী অভিধান (১৮১৫-১৮২৫)—A Universal Dictionary of Oriental Language.

রামরাম বসু লেখেন—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা—(১৮০২)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার লেখেন—বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি —(১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) ও প্রবোধ চন্দ্রিকা।

১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে কেরীর লেখা "কথোপকথন" বাংলায় লেখা প্রথম গদ্য গ্রন্থ। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ৩১টি অধ্যায় এতে দেওয়া হয়েছে। জমিদার-প্রজা, জমি-জায়গা-চাষ-ক্ষেতখামার থেকে শুরু করে খাতক-মহাজন-ভদ্রলোক গ্রাম্য

জীবনের দৈনন্দিন সমস্ত বিষয়ের কথাবার্তার উদাহরণ আমরা কথোপকথনে পাই। কোন দেশকে চিনতে হলে তার মাটির সঙ্গে, তার মানুষের সঙ্গে সর্বাগ্রে পরিচয় হওয়া দরকার—তা কেরী উপলব্ধি করতেন, তাই বই-এর বিষয় নির্বাচনে তার বাস্তব বুদ্ধির ও যুক্তিবাদী মনের পরিচয় আমরা স্পষ্ট রূপে পাই। বাংলা ভাষায় সাধারণ আটপৌরে রূপটির পরিচয় আমরা পাই কথোপ-কথনের মাধ্যমে। তাই কেরীকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি খাঁটি বংলো গদ্য স্রষ্টাদের পথপদর্শক হিসেবে। তবে কেরী সাহিত্যশিল্পী নন। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঙ্গালীর সামাজিক বাহনকে তিনি তৈরী করলেন যুক্তি-চিন্তার বাহন হয়ে মানুষের জ্ঞান জীবনকে মুক্ত করতে। ইতিহাসমালায় ১৫০টি গল্পের অনুবাদ কেরীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বাংলা গদ্যের Syntax বা অন্বয়রীতি পরিস্ফুট হয়েছে।

দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ এবং আঞ্চলিক ভাষায় স্কুল স্থাপন এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন। জনশিক্ষা বিস্তারে মিশন সফলতা লাভ করেছিল তার প্রধান কারণ, কেরীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত মুদ্রিত গ্রন্থ সমূহ। বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক বই ব্যাকরণ, ইতিহাস ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বই প্রকাশ করে বাংলার জনশিক্ষা বিস্তার ও নবজাগরণের সোপান প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮২০ সালের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে ২৭ খানা বিভিন্ন বিষয়ের বই প্রকাশিত হয়।

লোকশিক্ষা ও ভাষাশিক্ষায় সংবাদপত্রের অপরিসীম গুরুত্বের কথা স্মরণ করে ১৮১৪ সালের এপ্রিল মাসে "দিগদর্শন" নামক মাসিক পত্রিকা এবং মে মাসে "সমাচার দর্পণ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। আঞ্চলিক ভাষায় বিদ্যালয় স্থাপন লক্ষ্যে কেরী মার্সম্যান প্রভৃতির নেতৃত্বে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার ফলস্বরূপ ১৮১৬ সাল থেকে ৩ বছরের মধ্যে একমাত্র হুগলি জেলাতেই ৫৪টা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, যার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৬৮৪ জন। এছাড়াও অন্যান্য জেলা মিলিয়ে আরও মোট ৫৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, এবং সর্বমোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১৫৫ জন।

১৮১৭ সালের ৬ই মে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির পরি-চালক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন উইলিয়াম কেরী। কেরীর মানসিকতার পরিচয় আমরা পাই ঐ সোসাইটির দ্বিতীয় রিপোর্টে, সেখানে তাঁরা বলেছেন —ধর্মমূলক কোন পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা সোসাইটির নেই। তবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় মতকে আঘাত না করে দেশীয় সমাজের চরিত্র ও নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য নীতি কথা বিষয়ক পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হবে না।

দেশীয় ছাত্রদের নৈতিক মান ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, মাতৃভাষায় পুস্তক প্রকাশ করবেন এবং সস্তাদরে বা বিনামূল্যে তা বিতরণ

করবেন। ১৮১৭ থেকে ২১ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশনের সাহায্যে ৪টি ইংরাজী বই সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মোট ৫৪খানি পুস্তকের ১৫০৯৭১টি কপি প্রকাশ করেন, যার মধ্যে ২৪ খানা বাংলা ভাষার পুস্তকের ৯৮২৫০টি কপি ছিল।

উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে যে বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিল শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তার ফলে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে এ দেশের। সাধারণ মানুষদের একটি আত্মিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের পক্ষে বাংলা দেশের জীবন ও সংস্কৃতির জ্ঞান লাভ সহজতর হয়েছিল বাংলা দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে যার ভূমিকা ছিল অসামান্য।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিতে অনেক মহৎ ইংরেজ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। কিন্তু যার মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচার সেই উইলিয়াম কেরী তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে অনেকাংশে সরে এসে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও প্রসারে যে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ও বাঙ্গালী অশেষ উপকৃত হলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে উইলিয়াম কেরীর ধর্মপ্রচারকের ভূমিকার চেয়েও বাংলা ভাষার প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এইখানেই উইলিয়াম কেরীর অনন্যতা।

—ঃ—

ডঃ উইলিয়াম কেরীর বিজ্ঞানমনস্কতা

সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়*

আঠারো শতকের মধ্যভাগে শৃঙ্খলভাঙ্গার নেশায় ইউরোপের শোষিত জনগণ যখন নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ যখন উদ্ভাসিত করেছে ইউরোপকে তখন ইংলণ্ডের এক স্তিমিত গ্রামে (পলার্স-পিউরী) ১৭৬১ সালের ১৭ই আগষ্ট মহাত্মা কেরীর আবির্ভাব হয়। এই শতকের তিনদশকে ইংলণ্ডের জল, মাটি আর পরিবেশ গড়ে তোলে এই মহা-সাধকের বিজ্ঞানী মন। চাঞ্চল্যহীন ইংলণ্ডের গ্রামে তখন অগণিত মানুষ দারিদ্র্য ও কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে চলেছে। গ্রামের রাস্তা ঘাট ও চাষের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। জেমস্ ওয়াটের ষ্টিম ইঞ্জিন (১৭৬৫) এবং আর্করাইটের তাঁত বোনা যন্ত্র (১৭৬৮) প্রচলিত হবার আগে ইংলণ্ডে কোন বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি। বিজ্ঞান সচেতনতার অভাবে গ্রামের কুটির শিল্পের উন্নতির পথ ছিল রুদ্ধ। শ্রমিকরা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। তারা মজুরী পেত সপ্তাহে ৫ শিলিং থেকে ২০ শিলিং-এর মধ্যে। সর্বাঙ্গে-নিদারুণ দারিদ্র্যের ছাপ নিয়ে কেরীর বাল্যজীবন কাটে। এখানে অনুসন্ধিৎসু মন গড়ার পরিবেশ থাকলেও বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য কেরীকে নিজের ওপরই বেশী নির্ভর করতে হয়েছিল।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডের চেহারা দ্রুত পাল্টাতে থাকে। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের ঢেউ ইংলণ্ডের শিল্পকে তাড়াতাড়ি উন্নত করে এবং বিজ্ঞান সচেতনতাও বাড়ে ব্যাপকভাবে। এর প্রভাব অখ্যাত গ্রামগুলির ওপরও পড়ে। এই সময় বহির্বিশ্বে ইংলণ্ডের উপনিবেশের প্রসার গ্রামের বালকদের মধ্যেও আশা জাগায়। দুঃসাহসিক অভিযানপ্রিয়তা বিপুলভাবে বাড়ে। ধর্মীয় অনুশাসনের শৈথিল্য যেমন নৈতিক অবনমনের সহায়ক ছিল তেমনি বিজ্ঞান সচেতন মানবিকতাবোধ বিকাশের সহায়ক ছিল না। দরিদ্র ব্যাপটিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল বিশেষভাবে প্রকটিত। বালক কেরীর বিজ্ঞান সচেতন মন গড়তে এই ক্ষোভের কিছু ভূমিকা হয়ত ছিল।

কেরীর বিজ্ঞান মনস্কতা ঠিক কিভাবে বা কার প্রভাবে তৈরী হয়েছে তা জানা যায় না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের জীবনীও তিনি পড়েন নি। প্রেরণার একমাত্র উৎস ছিল তাঁর বাবা। তিনি বালক কেরীকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের গল্প বলে তাঁর মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক উপাদান সংগ্রহ ও জমা করার প্রবণতা

---

* শ্রী সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক এবং উইলিয়াম কেরীর উপর বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এনে দেন। মিউজিয়ম গড়ার মধ্য দিয়েই কেরীর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন তৈরী হয়। কাকা পিটার তাঁর মধ্যে কৃষি কাজের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাঁর কৃষি বিজ্ঞানী মন গঠনে কাকার কতটা অবদান ছিল তা জানা যায় না।

কেরীর বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলে তাঁর প্রাকৃতিক রহস্যানুসন্ধানী মন যা তাঁর বিজ্ঞান সচেতন পর্যবেক্ষণকে সুপরিণত করে। গ্রাম্য পরিবেশের সংগে তাঁর বন্ধন ছিল নিবিড়। পাহাড়, মাঠ, বাগান, অরণ্য, নদী আর বিচিত্র পশুপাখী প্রভৃতি তাঁর কৌতূহলী মনে জাগায় গভীর মমত্ববোধ। বিজ্ঞানের গ্রন্থপাঠও তাঁর বিজ্ঞানী মন গঠনে সাহায্য করে। বিচিত্র প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, ঐগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহেও ছিল তাঁর সমান উৎসাহ। সেই কিশোর বয়সেই তিনি তাঁর বিজ্ঞান পাঠের নোটবুক রাখা শুরু করেন।

প্রকৃতি পাঠের মধ্য দিয়েই হয় তাঁর বিজ্ঞান সাধনার সূচনা, মানবপ্রেম সেই সাধনাকে করে উদ্দীপিত আর ঈশ্বর ভক্তির দ্বারা সেই সাধনা পায় অপরিমেয় শক্তি। তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা কোন একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে সব বিষয়ের ওপর প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানের সব শাখাই ছিল তাঁর অনুশীলনের বিষয়। বিজ্ঞানের সব শাখাকেই মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন।

প্রপীড়িত মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁর সংবেদনশীল মনের বেশীর ভাগ দখল করে থাকে। তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা প্রকৃতির উপাদান ও শক্তির সাহায্যে মানুষের দুঃখ দূর করার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়। তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগের প্রতি তিনি বেশী মনোযোগ দেন। প্রথাগত শিক্ষাহীন কেরী তাই তাত্ত্বিক নন, ফলিত বিজ্ঞানী। খৃষ্টের প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও নির্ভরতা তাঁর বিজ্ঞান সাধনাকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করায় উদ্বুদ্ধ করে। কেরীর ধর্মচেতনাকে কেন্দ্র করেই থাকে তাঁর মানবচেতনা ও বিজ্ঞানচেতনা।

বিজ্ঞানানুরাগী কেরীর মধ্যে কয়েকটি মহৎ গুণের বিকাশ দেখা যায়। স্বয়ং বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গুণগুলি হল, সততা, দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, ধৈর্য, একাগ্রতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি। তাছাড়া গভীর ঈশ্বর-ভক্তি, ধর্মশীলতা ও মানবিকতা ছিল তাঁর গৌরবোজ্জ্বল সফল জীবন গঠনের প্রধান সহায়ক। বিজ্ঞানী মন তাঁর মধ্যে সঞ্চার করে নিয়মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞানানুগ অনুশীলন ও প্রতিবেদন প্রভৃতি। ধর্মপ্রচারক সংঘ গড়ার জন্য তরুণ কেরী একক প্রচেষ্টায় "এন এনকোয়ারী" নামে যে প্রচার পুস্তিকাটি সংকলন করেন তার বক্তব্য বিন্যাস ও প্রতিবেদনে পাওয়া যায় তরুণ-কেরীর বিজ্ঞানানুগ মনের পরিচয়।

ইংলণ্ডের ৩২ বছর জীবনে কেরীর বিজ্ঞান সাধনা এগোবার বিশেষ সুবিধা পায় নি। বাংলাদেশেই শুরু হয় তাঁর বিজ্ঞান সাধনা। ১৭৯৩ সালে এদেশে

পদার্পন করেই তিনি বাংলার বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যান। ভাষা শিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের সংগে নতুন করে শুরু করেন বিজ্ঞানচর্চা। তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা নতুন ধারায় প্রবাহিত হয় এখানে।

প্রথাগত বিজ্ঞান শিক্ষার কোন সুযোগ কেরী পাননি এবং শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরও সাহচর্য পান নি। এখানে তিনি রক্সবার্গ, ওয়ালিচ প্রমুখ বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা নতুন করে উদ্দীপিত হয়। শ্রীরামপুরে আসার পর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন। এখানে বহু বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানীর সংগে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর বিজ্ঞান চিন্তা একটি পরিপূর্ণ রূপ পায়। বিজ্ঞানকে মানব সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করার যে আশা তিনি মনে পোষণ করেছিলেন তা রূপায়িত করার সুযোগ তাঁর সামনে উপস্থিত হয় এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার শিক্ষা, গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রণী হন।

বিজ্ঞানানুগ উপায়েই তিনি তাঁর বিজ্ঞান চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে ব্রতী হন। তাঁর চিন্তা ছিল মানব কল্যাণ প্রয়াসী, তাই ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর জোর দেন। ভারতের দরিদ্র মানুষের আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা চিন্তা করে তিনি উদ্ভিদ ও বন সংরক্ষণ, কৃষি ও উদ্যানবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা তত্ত্বীয় বিজ্ঞান (natural philosophy), আর্থিকবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার শিক্ষা, গবেষণা ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁর বিজ্ঞান চিন্তার আর একটি দিক হল তিনি অপরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন যাতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় সমাজের সকল স্তরের মানুষ সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতায় বিজ্ঞান সাধক গঠনও উপেক্ষিত হয়নি।

উদ্ভিদ, উদ্যান, কৃষি ও বনসংরক্ষণকে কেরী তার বিজ্ঞান সাধনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেন। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশে পদার্পণ করার পর তিনি সবচেয়ে বেশী ভালোবেসে ফেলেন এদেশের বিচিত্র সম্ভারে ঐশ্বর্যশালী প্রকৃতিকে এবং সবচেয়ে মর্মাহত হন এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবির দুঃখ দুর্দশা দেখে। উদ্ভিদ ও কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির মধ্য দিয়ে ঐ সব দুর্গত মানুষের সেবা প্রত্যক্ষভাবে করতে পারবেন। মদনাবাটীতে থাকার সময়েই (১৭৯৪-৯৯) তিনি উদ্যান, বীজাগার, খামার প্রভৃতি গঠন করেন, শুরু করেন বীজ বিনিময় এবং নীলচাষ, ধান চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মনে করেন বীজ বিনিময় ও সারের দ্বারা উদ্ভিদ উৎপাদনের উন্নতি করলে যেমন আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার প্রতি এদেশের মানুষ অনুরক্ত হবে, তেমনি দরিদ্র

কৃষিজীবীদেরও উপকার হবে। তবু এ সময়ে তিনি প্রধানতঃ ছিলেন পর্যবেক্ষক এবং তাঁর বিজ্ঞানচর্চা নতুন রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। তিনি অনুভব করেন খাদ্য, পরিধেয়, ঔষধ প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছুরই বিপুল সম্ভার আছে এদেশের প্রকৃতিতে যা এদেশের সব মানুষকেই দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এরজন্য দরকার বিজ্ঞানানুগ অনুশীলন ও ব্যাপক প্রয়োগ। কিন্তু শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কার্যকরী কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

শ্রীরামপুরে আসার পর তাঁর বিজ্ঞান চিন্তা মানুষের দিকে আরও ধাবিত হয় এবং তাঁর বিজ্ঞানীমনের উত্তরণ হয় বিজ্ঞান অনুশীলনের সংগঠকরূপে। শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি উদ্ভিদ উদ্যান ও গবেষণা কেন্দ্র এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন সকলের দিকে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পঠন সুরু হয় মিশন বিদ্যালয়ে। বীজ ও চারাগাছ বিনিময়ের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে উদ্ভিদ বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। ১৮১৮ সালের পর থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নিয়মিত শিক্ষা দান ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। কেরী তাঁর উদ্ভিদবিজ্ঞানী বন্ধু রক্সবার্গের গবেষণালব্ধ ফলকে হর্টাস বেঙ্গলেনেসিস ও ফ্লোরা ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ভারতে বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। কেরীর নিজস্ব গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ডঃ ভয়েট কেরীর গার্ডেন বুকের সাহায্যে প্রকাশ করেন হর্টাস ক্যালকাটা সুবার্বনেসিস্। বইটি কেরীর উদ্ভিদ উদ্যানের পরিচয় বহন করে।

কৃষি ও উদ্যান বিদ্যার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কেরী তাঁর কিশোর বয়স থেকেই। বাংলায় এসে তিনি যখন দেখেন এদেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র কৃষিজীবী এবং অবহেলিত অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্য এদের দুর্দশার অন্ত নেই। তখন ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানী কেরী এদেশের কৃষি উন্নয়নের প্রয়াসকে তাঁর ধর্ম সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ রূপে মনে করেন। মানবতাবাদী কেরী উপলব্ধি করেন রাষ্ট্র ও সমাজ শাসকদের দ্বারা অবহেলিত কৃষির উন্নতি না করলে এদেশে সজীব ও সচেতন সমাজ গড়া সম্ভব নয়। ১৭৯৪তেই এই চিন্তা তাঁর মাথায় আসে এবং ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান। কিন্তু বোঝেন যে তাঁর একক বা শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায় এ বিষয়ে কিছু করা যাবে না। তিনি শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষায় উদ্ভিদ ও কৃষির ওপর গুরুত্ব দেবার বাবস্থা করেন।

১৮০৬-০২ সালে তিনি কলকাতার শ্রেষ্ঠ বিদ্বজনসভা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হবার পর আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন প্রাচ্যতত্ত্বে অনুরাগী অভিজাত ইউরোপীয়দের দৃষ্টি এই গুরুতর সমস্যার দিকে ফেরাবার জন্য। কারণ,

তিনি জানতেন এঁরা উদ্যোগী হলে সরকার ও দেশীয় জমিদাররা এদেশের কৃষি ও কৃষকদের দুরবস্থার দিকে নজর দেবেন। দেশের সংকটজনক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর বিজ্ঞান চিন্তা প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। ১৮০৮ সালের সভায় তিনি দিনাজপুরের কৃষি ও কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে উন্নতির উপায়গুলি আলোচনা করেন। এই আলোচনা ১৮১১ সালের এশিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশিত হয়। তাঁর উদ্দেশ্য বোধ হয় সফল হয়নি, তিনি চাইলে কি হবে. সোসাইটি দেশের সমস্যা সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে রাজী হয় নি। তাই এ-সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ধামাচাপা পড়ে যায়। কেরী হতাশ হলেও নিরুৎসাহ হন নি। একনিষ্ঠ বিজ্ঞান সাধক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য যেমন বার বার চেষ্টা করেন, কেরীও তেমনি তাঁর প্রয়াসকে অব্যাহত রাখেন। ১৮১৮ সালে ফ্রেন্ড অএ ইণ্ডিয়া ও সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হলে দেশের করুণ কৃষি ব্যবস্থার প্রতি সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। ১৮২০সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের সহায়তায় তিনি কলকাতায় এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য দেশের কৃষি ও উদ্যান ব্যবস্থার উন্নতি করা। এবারে তাঁর উদ্দেশ্য কতকাংশে সফল হয়। সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে কেরী তাঁর উদার বিজ্ঞান চিন্তা অর্থাৎ বিজ্ঞান সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যগুলি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) সমগ্র ভারতের কৃষি সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ, (২) উন্নতমানের কৃষিকার্য, সার দেওয়া, শস্য রোপনের পর্যায় বৃদ্ধি, জলসেচের ব্যবস্থা, বাঁধের ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ, (৩) নতুন উদ্ভিদ চাষের ব্যবস্থা। (৪) কৃষি খামারের উন্নতি। (৫) কৃষি কাজে নিযুক্ত পশুদের উন্নতি। (৬) অনাবাদী পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি। তাছাড়া তিনি কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেবার এবং সমগ্র ভারতে সোসাইটির কর্মক্ষেত্র বিস্তার করারও চেষ্টা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নতমানের যীজ আনিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া প্রচলিত করেন। গবেষণার জন্য অনুদানের সুপারিশ করেন। সারাভারতে কেরীর এই প্রয়াস বিপুলভাবে সাড়া জাগায়। অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ্ণৌ, পশ্চিম ভারত, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বাংলায় ঢাকা, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানে সোসাইটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরীর বিজ্ঞান চিন্তা সবচেয়ে সফলভাবে রূপায়িত এই ক্ষেত্রে।

প্রকৃতি প্রেমিক বিজ্ঞানী কেরী বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভারতের বনজ সম্পদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন এবং জানতেন এই সম্পদকে মানুষের কল্যানে কাজে লাগানো সম্ভব। তাছাড়া তার বিজ্ঞানী মন দিয়ে বুঝেছিলেন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই বনজ সম্পদের সংরক্ষণ বিশেষভাবে প্রয়ো-

জন। বর্তমানে আমরা যে পরিবেশ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি তার সূচনা দেখা যায় কেরীর চিন্তার মধ্যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। কেরীর অনুরোধে সরকার বনসংরক্ষণ কমিটি গঠন করে এবং এর আহবায়ক রূপে কেরী ভারতের বনজ সম্পদ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিবরণ সরকারের কাছে পেশ করেন।

মানুষকে ঘিরেই ছিল কেরীর বিজ্ঞান চিন্তা, তাই আধুনিক বিজ্ঞান সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জাগুক এটাই আন্তরিকভাবে তিনি চান। তাই সকলের জন্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগের শিক্ষার কথা চিন্তা করেন। শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়। কেরীর চিন্তাভাবনা অনুযায়ী এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল (১) বিজ্ঞান শিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য মাতৃভাষায় সর্বপর্যায়ের শিক্ষা দান। এর জন্য ইংরাজী বই অনুবাদের ধ্যবস্থা করা হয় এবং পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা, শারীর বিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের বাংলা (এবং কিছু কিছু হিন্দী) অনুবাদ করা হয়। (২) তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে অনুরাগী হবে শুধু বুদ্ধিমানরা, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহায়িক প্রয়োগের প্রতি আকর্ষণ সকলের হতে পারে যা সমাজে সহজে বিজ্ঞান সচেতনতার প্রসার করবে, তাই কেরী বীক্ষনাগার, সংগ্রহ শালা, প্রভৃতির সাহায্যে দ্রুত বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার করার আয়োজন করেন। (৩) দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ ও ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রিকাগুলির সাহায্যে গ্রাম ও শহর সর্বত্র বিজ্ঞানচর্চার কথা প্রচার করেন। (৪ সকলকে পড়ার সুবিধা দেবার জন্য বিদ্যালয়ে বিনা বেতন ও কলেজে স্বল্প বেতনের ব্যবস্থা করে এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পড়ার সুযোগ গ্রহণের সমান অধিকার দেন।

তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় সারণী প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়েও কেরীর বিজ্ঞানী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন গণিত, রসায়ণ, পদার্থবিদ্যা, শারীর বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার প্রতি কেরীর অনুরাগ কম ছিল না, তিনি ঐ সকল বিষয়ের প্রামান্য পুস্তক সংগ্রহ করেন নিজে পাঠ করার জন্য এবং চিন্তা করতেন কি ভাবে ঐ সব বিষয়কে মানুষের দুঃখ দূর করার কাজে নিয়োগ করা যায়। ঐ সকল বিষয়ের অনুশীলন ও পঠনের সকলরকম ব্যবস্থা শ্রীরামপুর মিশনের বিদ্যালয় ও কলেজে করা হয়।

কেরীর বিজ্ঞানী মনের গঠন ছিল প্রযুক্তিভিত্তিক। তাই বিজ্ঞানানুসারী আধুনিক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ভারতে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি চিন্তা করেন একদিকে যেমন কৃষিকাজের উন্নতির দ্বারা ভারতের জন-

সংখ্যার বৃহদাংশের মঙ্গল সাধন করা যাবে তেমনি আধুনিক ধারায় বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সংগে দেশীয় সমাজের প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রতিভার বিকাশে অনেক সাহায্য করা সম্ভব। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের চিন্তা কেরীর মাথায় আসে যখন তিনি বাংলা নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ সমাপ্ত করে বইটির মুদ্রণের চেষ্টা করেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ইংলণ্ডে বইটি ছাপাতে যে বিপুল ব্যয় হবে তা সংগ্রহ করা সাধ্যের অতীত। এদেশে ছাপাবার কথা ভাবার সংগে তিনি নিজেই এই মুদ্রণশিল্পটি পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেন। কলিকাতায় এই শিল্পটি প্রচলিত হলেও খুব জনপ্রিয় হয় নি। এই শিল্প পরিচালনায় যদি সফল হওয়া যায় তবে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি স্বনির্ভর মিশন গড়তে পারবেন। এ সময় শিল্পটি সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু শিক্ষালাভেচ্ছু মন শিল্পটি জানতে বিশেষ আগ্রহী হয়। তিনি প্রেস, হরফ ও অন্যান্য জিনিষ মদনাবাটীতে থাকার সময়েই সংগ্রহ করেন। কিন্তু ছাপার কাজ ওখানে শুরু করতে পারেন নি, শুরু করেন শ্রীরামপুরে আসার পর। এখানে এসে তিনি পান মুদ্রণ-বিশারদ উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং হরফশিল্পী পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর কুশলী সহযোগীবৃন্দের সহায়তা। তখনই তিনি বিজ্ঞানানুগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহৎ মুদ্রণশিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন এবং সেই অনুযায়ী মুদ্রণের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তোলেন হরফ শিল্প, কাগজ শিল্প, কালি উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি। ১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে এই শিল্প কেন্দ্রটি এশিয়ার বৃহত্তম এবং প্রাচ্য ভাষায় পৃথিবীর বৃহত্তম মুদ্রণ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। এর পেছনে ছিল কেরীর বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ। দেশীয় প্রতিভার সাহায্যে ভারতে বৃহৎ শিল্প গড়া যে সম্ভব তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তিনি উনিশ শতকের গোড়াতেই স্থাপন করেন, কিন্তু সমসাময়িক দেশীয় সমাজে এই দৃষ্টান্ত বিশেষ কোন ছাপ ফেলেনি। ইংরেজরাও সন্তুষ্ট হননি, কারণ এই শিল্পের আয় ইংলণ্ডের জনসাধারণের দারিদ্র্য মোচনে কাজে লাগেনি।

দেশের গরীব মানুষের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য সংবেদনশীল বিজ্ঞানী কেরী এদেশে সঞ্চয় ব্যাঙ্ক প্রচলনের চেষ্টা করেন এবং কয়েকবছর সাফল্যের সংগে ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করেন। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য ব্যাঙ্কটি বন্ধ করে দিতে হয়। এই বিষয়টি সম্পর্কেও তিনি অর্থশালী দেশীয়দের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেন নি।

জীবনের সায়াহ্নে কেরী অতৃপ্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর সব পরিকল্পনাকে রূপায়ণ করেন। কিন্তু হতাশ হন এই দেখে যে দেশের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার সার্থক প্রচেষ্টায় যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন তা দেশীয় সমাজের ওপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

—:—

সমাজ সংস্কারক উইলিয়াম কেরী

মলয় দেওয়ানজী*

উইলিয়াম কেরীর বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ আমরা তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র—শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্কার ইত্যাদিতে দেখতে পাই। ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে স্থানীয় ভাষার বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি সমাজ সংস্কারেও তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে সমাজসংস্কারের কাজে বিশেষতঃ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারে কেরী এবং তাঁর সহকর্মী জশুয়া মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন জায়গায় দেশীয় বিদ্যালয় খুললেও শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা নেন কেরীর সহকর্মী জশুয়া মার্শম্যান। তবে মার্শম্যান ও তাঁর স্ত্রী হানা মিশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনাটি তৈরী করেছিলেন কেরী। শিক্ষাক্রম সম্বন্ধে কেরীর পরিকল্পনা ছিল ঃ "They are to be taught the Sanskrit, Bengalee and Persian languages The Bible is to be introduced there and perhaps a little philosophy and geography. The time of their education is to be seven years…"। কেরীর এই পরিকল্পনা মালদহের মদনাবাটীতে নানা কারণে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষাবিস্তারের কাজে কেরীর উপরোক্ত পরিকল্পনাই কার্যকর করা হয়েছিল।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তী বছরগুলিতে গ্রাম বাংলার নানা স্থানে আরো অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব স্কুলে মিশনারীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর নতুন আইনে দেশীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকার বরাদ্দ নির্দ্ধারিত হওয়ায় বাংলাদেশে শিক্ষার জগতে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। কেরী এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের নিকট এক

---

* মলয় দেওয়ানজী একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও বর্তমানে উইলিয়াম কেরী স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত॥

নতুন পরিকল্পনা পেশ করেন এবং তাঁর অন্যতম প্রস্তাব ছিল যে, এই আর্থিক অনুদানে ভারতীয়দের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ানো হোক। কেরীর এই প্রস্তাব ইংরেজ শাসক মেনে নেননি। ইংরেজ শাসকবর্গের প্রত্যাখ্যানে হতাশ না হয়ে কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ভারতীয়দের শিক্ষা বিস্তারে নিজেরাই বিশেষ উদ্যোগী হলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান "Hints relative to Native Schools etc." প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় গোষ্ঠীর মানুষদের কাছ থেকেই প্রভূত পরিমাণে আর্থিক সাহায্য এসেছিল। এর ফলে পরবর্তী দুই বছরে শতাধিক স্কুল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে ছয় হাজারের বেশী ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল। মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যমে হিসাবে প্রয়োগ করা, প্রাচ্যের সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উপযুক্ত সমন্বয়ে শিক্ষার পাঠক্রম তৈরী করা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপ সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া ইত্যাদি পদক্ষেপ কেরীর সার্বজনীন বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও দৃঢ় নেতৃত্বের গুণেই সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয়দের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে কেরীর এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপগুলি ভারতীয় নবজাগরণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষা দেবার যে প্রস্তাব কেরী কোম্পানীকে দিয়েছিলেন তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন নিজেই ভারতীয়দের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক যে প্রসপেক্টাস প্রচারিত হয়, তাতে বলা হয়—'A college for the instruction of Asiatic Christian and other youth in Eastern Literature and European Science.' কলেজের পাঠ্যক্রম হিসাবে সংস্কৃত, আরবী, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ইংরাজী পড়ানো স্থির হয়। ইংরাজীকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও কলেজে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটা কোর্স এবং খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্যও একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর কলেজের আস্তে আস্তে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং মার্শম্যানের উদ্যোগে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের কাছ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ ডিগ্রী প্রদান করার অধিকার পায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কেরীর ভূমিকাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হলে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির (১৮১৭) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককেও অনুধাবন করতে হবে। স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম পরিচালক সমিতিতে কেরী অন্যতম সম্মানিত সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে

কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকরূপে যে কাজের সূচনা করেছিলেন, সোসাইটিও সেই পথটিই অনুসরণ করেছিলেন। সোসাইটি বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলির জন্য পাঠ্যপুস্তক সংকলন ও প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং চার বছরের মধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার কপি বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এই স্কুল বুক সোসাইটির ধর্ম-নিরপেক্ষ কর্মকাণ্ডের পিছনে কেরীর যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই কেরী রাইল্যাণ্ডকে চিঠিতে লেখেন—ভারতীয়রা 'now unite with Europeans, Europeans with them in promoting benevolent undertakings, without servility on their part or domination on ours. God is doing great things for India.'

কেরী বহু বছরের অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রমে ভারতের ১৩টি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় একটি বহুভাষিক শব্দকোষের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন! পাণ্ডুলিপিটির মূল ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা অক্ষরে লেখা। কিন্তু বহু ভাষাবিদ হিসাবে কেরীর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিটি দুর্ভাগ্যক্রমে আজও প্রকাশিত হয়নি। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই পুড়ে যায়। অবশিষ্টাংশ শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। কেরী বহুভাষিক শব্দকোষটি অমর সিং-র বিখ্যাত সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষের অনুসরণে লিখেছিলেন। কেরী বহুভাষাভাষী ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে একটি বহুভাষিক শব্দকোষ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর রচিত বহুকোষটির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটির প্রকাশ আজ আরও বেশী প্রয়োজনীয়।

কেরীর বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবদরদী মন শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে দূর করবার উদ্দেশ্যে আজীবন নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে শক্তি যুগিয়েছে। বাংলাদেশে পদার্পণের কিছুদিনের মধ্যেই সাগরে শিশু সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, কুষ্ঠরোগী হত্যা, গঙ্গাজলী, চড়ক ইত্যাদি বিভিন্ন বর্বরোচিত কুপ্রথা কেরীর সংবেদনশীল মনকে বিশেষ-ভাবে নাড়া দেয় এবং ফলস্বরূপ, সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালনের সংকল্প গ্রহণ করেন কেরী। তাঁর এই মানবতাবাদী সংকল্পের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল আসলে তাঁর খ্রীষ্ট-ধর্ম-বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্য থেকে। একজন সৎ খ্রীষ্টানের মানবতাবোধে কেরী উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে বাংলাদেশে সমাজ সংস্কারক কর্মকাণ্ডের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্যকে অবদমিত করে তাঁর মানব হিতাকাঙ্কার প্রাধান্যই সূচিত হয়েছিল।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ উডনী প্রথমে সাগরে শিশুসন্তান বিসর্জন প্রথাটি কেরীর নজরে আনেন। কোন বড় বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ গঙ্গাসাগরে শিশু বিশেষতঃ কন্যাসন্তান বিসর্জনের মানত করতো। প্রতি বছর পৌষমাসে সাগরদ্বীপের মেলায় শত শত শিশু সাগরের জলে বিসর্জন ছাড়াও অনেক বিধবা ও বয়স্ক ব্যক্তিরাও কুসংস্কারের প্রভাবে পুণ্য স্বর্গ-কামনায় সঙ্গমে আত্মবিসর্জন করতেন। জর্জ উডনী ও কেরী উভয়ের চেষ্টায় লর্ড ওয়েলেস্‌লীর দৃষ্টি এই বর্বর কুপ্রথার দিকে আকৃষ্ট হয়। তখনও ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্বে স্থায়ীত্ব না আসায় কোম্পানী এদেশের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করারই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু কেরীর আগ্রহে ওয়েলেস্‌লী প্রথাটির ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন প্রশ্নে, কেরীকে অনুসন্ধান করে বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করতে বলেন। কেরী বিভিন্ন হিন্দু পণ্ডিতদের মতামত নিয়ে ওয়েলেস্‌লীকে রিপোর্ট দেন, '…a criminal and inhuman practice of sacrificing children, by exposing them to be drowned or devoured by sharks, prevails ··This practice is not sanctioned by the Hindoo Law, nor countenanced by the religious orders.' অর্থাৎ, কেরী জানান যে, প্রথাটি সামাজিক কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুশাসনের অঙ্গ নয়, এবং প্রথাটি রদ করা হলে হিন্দু সমাজে কোন গণ্ডগোল হবার ভয় নেই। কেরী মিশনারী হয়েও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সংস্কারমুখী করার উদ্যোগ নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁর অধ্যাপক পদাধিকার এবং তাঁর পুরণো বন্ধু জর্জ উডনী ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন। জর্জ উডনীর অনুরোধে এবং কেরীর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ওয়েলেস্‌লী ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথাকে হত্যাকাণ্ড, এবং যে এই প্রথা অনুসরণ করবে তাকে হত্যাকারীরূপে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে বলে আইন প্রণয়ন করলেন। ইংরেজের আইন দ্বারা হিন্দু সামাজিক প্রথা নিষিদ্ধ হওয়া এই প্রথম। মার্শম্যানের ভাষায়—"This was the first instance of any interference by the British Government with religious observances of the natives, and the first vindication of the principles of humanity in opposition to the superstitious feelings of the people." তাই ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কেরী অবশ্যই পথিকৃতের গৌরব ও সম্মান পাওয়ার অধিকারী।

সাগরে সন্তান-বিসর্জন আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়ায় কেরীর মানব হিতাকাঙ্খার প্রয়াস একটি বিরাট স্বীকৃতি পায় এবং এই সার্থকতা তাঁকে সতীদাহ-প্রথা রদ করার কার্যকর প্রয়াসে অনুপ্রেরণা দেয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিজে সতীদাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরে

যাওয়া আসার পথে গঙ্গার ধারে অনেক সতীর চিতা জ্বলতে দেখেছিলেন। সতীদাহ প্রথার বর্বরতা তাঁর মানবদরদী মনকে বিশেষ বিচলিত করেছিল। কলকাতার চারদিকে ত্রিশ মাইল এলাকায় সতীদাহ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তিনি বিশ্বাসভাজন কয়েকজন বাঙালীকে নিয়োগ করেন। উক্ত এলাকায় সতীদাহের সংখ্যা, সতীর বয়স ইত্যাদি বিষয়ে এক বছর ধরে সমীক্ষা করাই ছিল কেরীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমীক্ষায় প্রকাশ পেল যে, পূর্ববর্তী এক বছরে ওই এলাকায় ৪৩৮টি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছে,এবং সতীদের অধিকাংশই বালিকা। সমীক্ষায় আরো দেখা যায় যে, প্রধানতঃ বিধবাদের সম্পত্তি গ্রাস করার লোভেই সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামীরচিতায় তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। হিন্দুধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণের খেটে খাওয়া মানুষদের হাতে বিশেষ সম্পত্তিও ছিল না এবং তাই সম্পত্তির লোভে নিম্নবর্ণের বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার ঘটনাও বিরল ছিল। কেরী এই সমীক্ষার ফল এবং সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার দাবীপত্র জর্জ উডনীর মাধ্যমে ওয়েলেস্‌লীর নিকট পেশ করেন। ওয়েলেসলী তাদের দাবীপত্রটি আপীল আদালতের নিকট পাঠিয়ে তাদের মতামত জানতে চান। এদিকে হিন্দু রক্ষণশীল সমাজও সতী-দাহ প্রথা রদ করার প্রস্তাবের প্রবলভাবে বিরোধিতা শুরু করেন। হিন্দু রক্ষণ-শীলরা মত প্রকাশ করেন যে,হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কেরীর নেতৃত্বে মিশনারীরা হস্তক্ষেপ করছে। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক অসুবিধা হতে পারে চিন্তা করে আদালত রায় দেন যে, "দেশীয়দের বদ্ধমূল ধর্মীয় মতামত ও সংস্কারের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করার পরই কোন পরি-বর্তনের কথা চিন্তা করা উচিত।" এই রায় বেরোবার কয়েকদিনের মধ্যেই ওয়েলেস্‌লীকে গভর্নর জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হয়। এই পরিস্থিতিতে ওয়েলেস্‌লী প্রথাটি রদ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেরীকে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান ও দেশীয় জনসমাজে প্রথাটি নিষিদ্ধ করার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বলেন।

কেরী, উডনী ও ওয়েলেসলীর প্রাথমিক প্রয়াস এই ক্ষেত্রে সফল না হলেও কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা হাল ছেড়ে দিলেন না। কেরীর অনুরোধে লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী সতীদাহ প্রথা অনুমোদিত কিনা তার সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেন। তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিভিন্ন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিচার করে অভিমত দেন যে, "মৃত স্বামীর সাথে চিতার আগুনে পুড়ে মরা নয়, কিন্তু পরলোকগত স্বামীর জীবন্ত স্মৃতি জ্বলন্ত রূপে অন্তরে বজায় রেখে আমরণ ব্রহ্মচর্য, সর্বপ্রকার সংযম, ত্যাগ এবং পরসেবা করাই হিন্দু সতীর আদর্শ।" এই সময় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন। ধর্মমত

ব্যাপারে রামমোহনের সঙ্গে কেরীর মতানৈক্য থাকলেও এই আন্দোলনে পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন।

শ্রীরামপুর মিশনারীদের দুটি সংবাদপত্র The Friend of India এবং 'সমাচার দর্পণ' সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে প্রশংসাজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সংবাদপত্রের সামাজিক কর্তব্য পালনের উদাহরণ হিসাবে আজও অনুসরণযোগ্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের The Statesman কাগজের পূর্বসূরী The Friend of India-র প্রথম সংখ্যাতেই কেরী সতীদাহ সম্বন্ধে তথ্যমূলক আলোচনা প্রকাশ করে ভারতে সতীদাহর বিরুদ্ধে জনমতামত গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডে উইল্‌বারফোর্সের মাধ্যমে সতীদাহের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়তে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের উপর কেরীর যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল, তার ফলে মেটকাফ্, বেইলি প্রমুখ কেরীর ছাত্ররা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে গভর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে সতীদাহ প্রথা নিরোধক আইন প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

প্রায় কুড়ি বছর আগে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কেরী যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, সেই বিষয়ে ১৮১৯ সালে আইন প্রণীত হওয়ায় তিনি এত বেশী আনন্দিত হয়েছিলেন যে রবিবারে গির্জার প্রার্থনা সভায় যোগ না দিয়ে সারাদিন পরিশ্রম করে আইনটির বাংলা অনুবাদ শেষ করেন এবং পরের দিনই মিশন প্রেস থেকে ছেপে জনসমাজে প্রচার করেন।

তৎকালীন বাংলাদেশের আর একটি কুপ্রথা—কুষ্ঠরোগীকে জীবন্ত হত্যা করার প্রতিরোধেও কেরী অনেকাংশে সফল হন। সেই সময় কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা বা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা ছিল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়ায় পুত্র উইলিয়ামের কাছে থাকাকালীন একজন কুষ্ঠরোগীকে জোর করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কেরী সতীদাহ-র মত এই ঘটনাতেও অমানবিক নিষ্ঠুরতা ও দুর্বলের অসহায়তার রূপ দেখেছিলেন। কলকাতায় ফিরেই বিভিন্ন ধনী বদান্য ব্যক্তির সহায়তায় তিনি কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। কেরীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ-সংস্কারকেরা দিকে দিকে আওয়াজ তোলেন, "বেওয়া মাত্, জ্বালাও, বেটি মাত্ মারো, কোড়হি মাত্ দাবাও" (Thou shall not burn the widows, thou shall not kill thy daughters, thou shall not burn the lepers.)

এছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথা—জগন্নাথের রথের চাকায় আত্মবিসর্জন, চড়কে বাণ-বিদ্ধ হয়ে জীবনদান, গঙ্গাজলী ইত্যাদি দূরীকরণেও কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এইভাবে ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রণী পথিকৃতের গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার জন্য ভারতীয় বিশেষতং বাঙালী জাতি বিশেষভাবে কেরীর নিকট ঋণী।

সমাজসংস্কারক আন্দোলনের পাশাপাশি দরিদ্র ও অসহায়দের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার প্রচেষ্টাও ছিল কেরীর জীবনের ব্রত। তিনি মদনাবাটী ও শ্রীরামপুর উভয় জায়গাতেই দরিদ্র ও অসহায়দের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। দরিদ্র অভাবী মানুষেরা প্রকৃতিক দুর্যোগ ও নানা কারণে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ী, জমি-জায়গা সব হারাতো। মহাজনের কবল থেকে অভাবী মানুষদের বাঁচাবার জন্য ও সাধারণ মানুষদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে কেরী ১৮২০ সালে শ্রীরামপুরে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রথম বছরেই ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার পাউন্ড জমা পড়ে, কিন্তু চার বছর সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হলেও নানা সংকটের কারণে ব্যাঙ্কটি পরে বন্ধ হয়ে যায়।

১৭৯৩ সালে কেরী সপরিবারে ভারতবর্ষে এসে আর একবারের জন্যও ইংল্যান্ডে ফিরে যান নি বা যাবার চেষ্টা করেননি। বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে ৪০ বছরেরও বেশী সময় বাস করে তিনি পুরোপুরি বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা ভাষা তিনি মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। ১৮২৫ সালে এক বন্ধুর কাছে তিনি লিখেছিলেন, "My heart is wedded to India, and though I am of little use, I felt pleasure in doing the little I can."

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণে কেরী যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তার সর্বাপেক্ষা সঠিক মূল্যায়ন করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত কেরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, "গীতায় কর্মযোগীর যে সব বিশেষণ আছে তাঁর সবই কেরীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, কেরীকে আমি দধীচি বলেঅভিহিত করতে চাই। দধীচির মত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয়।"

বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের যে বীজ উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বপন করেছিলেন, তাই আজ ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিক সভ্যতার আলোকে আলোকিত করে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করেছে। মহামতি উইলিয়াম কেরীর প্রতি সকল বাঙালী তথা ভারতবাসী চিরকাল ঋণী থাকবে।

ভারতবন্ধু উইলিয়াম কেরী

সুনীল দত্ত *

বাংলা ভাষায় একটি প্রবচন আছে—"গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা"।

"ঈশ্বরের জন্য মহৎ কর্ম্ম শুরু কর

"ঈশ্বরের নিকট হইতে মহৎ বিষয় প্রত্যাশা কর"

অর্থাৎ

"Attempt great things for God"

"Expect great things from God."

'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজোর' মত মহাত্মা কেরীর মহান উক্তি দিয়েই এই নিবন্ধ তথা স্মৃতিচারণের বিনম্র সূত্রপাত।

পলার্সপিউরী এক গণ্ডগ্রাম। ইংলণ্ডের নর্দাম্পটনের মানচিত্রে বহুক্লেশে খুঁজে বার করতে হয়, এমনই গ্রামের এক দরিদ্র তন্তুবায় দম্পতি—এডমণ্ড ও এলিজাবেথ কেরী। ১৭ই আগস্ট, ১৭৬১ সালে তাদের পর্ণকুটিরে জন্ম হ'ল ফুটফুটে এক শিশুপুত্রের—তার নামকরণ করা হ'ল 'উইলিয়াম'। পুত্রসন্তান লাভে দরিদ্র দম্পতি পরম প্রীত, তবুও তাদের মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা। চিন্তা তাদের শিশুপুত্রের ভরণপোষনের জন্য। দারিদ্র সত্বেও পিতামাতার চিন্তার মাঝে উদয় হয় সন্তানকে পারিবারিক পেশায় নিযুক্ত না করে জীবনের মান উন্নত করার স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়—যা একমাত্র সম্ভব নবজাতককে কৃচ্ছসাধনের দ্বারা শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে। তাঁদের এই পুত্র কেরী দারিদ্র্যের নিষ্পেষণেও স্বীয় প্রচেষ্টায় গ্রীক, লাতিন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করেন—বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যাতেও তাঁর পরম আগ্রহ ছিল। পরিণত বয়সে যার পূর্ণবিকাশলাভ হয় বঙ্গদেশে থাকাকালীন। এই উদ্ভিদবিদ্যার সফল পরিণতি হাওড়ার 'শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন। এখানে সংগৃহিত বিরলশ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে আমরা তাঁর অবদান কি পাইনা? এদেশে "বৃক্ষরোপণের" স্রষ্টা কি তিনি নন? প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে তাঁর অবচেতন মনে "পরিবেশ দূষণের" বিষয়ে এভাবেই কি চিন্তাতরঙ্গ—Brain Wave খেলে যায়নি? প্রাকৃতিক ভারসাম্য (Ecological balance) রাখতে 'বৃক্ষরোপণ' উদ্যান রচনায় এদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল না

---

* শ্রী সুনীল দত্ত উইলিয়াম কেরী স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত

হয়ে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাগানের দেশীয় ফলমূলের ফলন বৃদ্ধি করিয়ে গাছের কল্যাণকর সুফলন পাইয়ে দিয়ে, সারা ভারতের মানুষকে তিনি উপকৃত করে গেছেন।

"মরুবিজয়ের কেতন শূন্যে উড়াও" এই সঙ্গীতের ডালি সাজিয়ে ১৪ই জুলাই তারিখটিকে "বনমহোৎসব দিবস" রূপে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পালন করতেন (একি অবচেতনমনে কেরীর স্বপ্নসাধনা?)। প্রায় দ্বিশতাব্দী পর আজ আমরা 'বৃক্ষরোপন' করে কেরীর প্রদর্শিত পথে 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য' রক্ষাকল্পে 'বনমহোৎসব' করছি—দলগতধ্বনি দিচ্ছি "নিজের পুষ্টি, নিজের সৃষ্টি"—"অন্নের অন্বেষণে বৃক্ষরোপণোৎসব।" ধন্য বিজ্ঞানী কেরী! কি অতলস্পর্শী তোমার দূরদর্শিতা! তোমার নামে আমরা শপথ ও দায়িত্ব নিয়েছি "অতিথি বালক তরুর দলকে চিরহরিৎ রাখার"।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অর্থাভাবে কেরীকে পড়াশুনা ছেড়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জুতার দোকানে কাজ নিতে হয়—কিন্তু পড়াশুনা ও জ্ঞানান্বেষণে তাঁর ছেদ পড়ে না। জুতার দোকানের মালিক হবার ভাবী সম্ভাবনাময়কালে কুড়ি বৎসর বয়সে ১৭৮১ সালে গ্রামের সরল, অশিক্ষিতা মালিকের শ্যালিকা শ্রীমতী ডরোথি প্ল্যাকার্ডের (কেরী অপেক্ষা পাঁচ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠা) সঙ্গে দরিদ্র সহিষ্ণু কেরী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রভুর ডাক পেয়ে ১৭৮২ সালে 'ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর' পালক সঙ্ঘে যোগদান করেন। এর সাত বৎসর পরে ১৭৮৯ সালে তিনি লিষ্টারে ধর্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। এসময়ে তিনি বিভিন্ন দেশে খৃষ্টধর্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে 'প্রচার-সঙ্ঘ' গঠিত করার আবেদন জানিয়ে 'এন এনকোয়ারী' নামক মনোজ্ঞ, প্রাণস্পর্শী পুস্তক প্রণয়ন করেন, যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। তারই গুরুত্বপূর্ণ ফলস্বরূপ ক্যাটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় ২রা অক্টোবর, ১৭৯২ সালে বিদেশে ধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হ'ল বৃটেনের প্রথম 'ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী সোসাইটী' সেই 'পাগলা পুরুত' কেরীর প্রচেষ্টায় (যাঁকে সর্বসমক্ষে একদিন বয়োবৃদ্ধরা সেই সভায় 'অকালপক্ক' বলে উপহাস করে তাঁর নব্য চিন্তা ও ভাবধারার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উড়িয়ে আচার্যদের কাছে কেরীর যুক্তি অলীক বলে প্রতিভাত কারণ বৃটেনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ক্যাটারিঙ গ্রামটি স্থানপ্রাপ্ত হয় বৃটেনের প্রথম মিশনারী সোসাইটীর জন্ম দিয়ে। ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর আচার্য কেরী সপরিবারে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আসেন তাঁর সঙ্গী হন ডাক্তার তথা ধর্মপ্রচারক জন্ টমাস।

তৎকালে যেসব ইংরেজ খৃষ্টান 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর' চাকুরী নিয়ে ভারতে আসতেন তারা 'মনুষ্যরূপ শয়তান' ছিলেন—তাঁরা ছিলেন খৃষ্টধর্মের কলঙ্ক। প্রভু যীশুকে ঐ সকল 'নামধারী খৃষ্টান' সাগরের জলে বিসর্জন দিয়ে লাম্পট্যে নিজেদের ভাসিয়ে দিতেন—যেন তেন প্রকারেণ স্থানীয়

দেশীয় জনসাধারণকে শোষণ করে তারা রাজৈশ্বর্য্য উপার্জন করত এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, রাজার হালে দিনযাপন করত। কেরীর মত উৎসর্গীকৃত, দৃঢ়চেতা, অপ্রিয় সত্যবক্তা মিশনারীকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করায় তাঁকে কলকাতায় ধর্মকার্য প্রচার করার অনুমতি দেননি—তাই তিনি জশুয়া মার্শম্যান ও রেভারেণ্ড উইলিয়াম ওয়ার্ড-র সহযোগিতায় ডাচদের অধিকৃত শহর শ্রীরামপুরে মিশনকেন্দ্র খোলেন। ঐ ত্রয়ী অক্লান্তকর্মী পুরুষের নিরলস প্রচেষ্টায় এখানে স্থাপিত হয় 'মিশনারী কর্মক্ষেত্র'। গৃহে তাঁর শান্তি নেই, কারণ তখন তাঁর স্ত্রী ঘোর উন্মাদিনী; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিগ্রহ, নির্যাতন, উৎপীড়ন, প্রতি পদক্ষেপে বিরোধিতা—স্থানীয় ব্যক্তিদের অসহযোগিতা, প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও কেরী তাঁর সংকল্পে ছিলেন স্থির ও অটুট—ধর্মপ্রচারই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কেরী সাহেব ঝড়ে ধরাশায়ী হননা—আঘাতে টলেন না—একলব্যের মত তিনি সাধনায় মগ্ন—যা মানব-কল্যাণধর্মী। এই মহামানব মনে করতেন যে, সকল সাফল্যই ঈশ্বরের দয়া—ইহা স্বীয় কৃতিত্ব নয়।

আচার্য কেরী গভীর মনোযোগেয় সঙ্গে তাঁর মুন্সী শ্রী রামরাম বসুর নিকট বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। মুন্সী ছিলেন দরদী, মনীষী শিক্ষক, তিনি কেরীর মধ্যে বাংলা ভাষায় যে সৃষ্টিধর্মী সম্ভাবনার বীজ প্রোথিত করেন তা যেন ছিল ঈশ্বরের অভিপ্রেত। শ্রী রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" বাংলাগদ্যের আদি মৌলিক রচনাও বটে।

কেরীসাহেব ১৭৯৮ সালে প্রধানতঃ বাংলায় বাইবেল ছাপার জন্য (কারণ তখন তিনি বাংলা শিখে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ শেষ করেছেন) একটি মুদ্রণযন্ত্র মদনাবাটীতে নীলাম মারফৎ কিনে আনেন (প্রকৃতপক্ষে জর্জ উড্‌নী নিলাম থেকে ৪০ পাউণ্ডে কিনে কেরীকে মুদ্রণযন্ত্রটী উপহার দেন)। গ্রামবাসীরা সোটর নাম দেয় 'সাহেবদের ঠাকুর'। ভাগ্যবিড়ম্বনা কিম্বা পরম করুণাময়ের ইচ্ছানুসারে তিনি সপরিবারে মুদ্রণযন্ত্রসহ ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৭৯৯ সালে মালদহ থেকে শ্রীরামপুরের (বা ফ্রেডারিক নগর নামে খ্যাত ডাচ, শহরে) উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী তাঁর নৌকা শ্রীরামপুরের ঘাটে এসে পেঁছায়। বঙ্গদেশে শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই প্রথম মুদ্রণযন্ত্র—প্রকাশিত হয় বাইবেলের বঙ্গানুবাদ। সেটা ১৮০০ সাল। মুদ্রণের শুরু হয় রেভারেণ্ড উইলিয়াল ওয়ার্ড, কেরীর দুই পুত্র ফেলিক্স ও উইলিয়াম এবং হরফ-শিল্প বিশারদ পঞ্চাননের (কেরীর অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় যিনি তৎকালে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ 'টাইপ-ফাউণ্ড্রি' গড়ে তোলেন) সহায়তায়। ১৮০০ থেকে ১৮৩২ সনের মধ্যে শ্রীরামপুরের মুদ্রণ কেবলমাত্র মুদ্রণ শিল্প নয়—শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবের সৃষ্টি করে।

ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অপ্রত্যা-

শিতভাবে গোয়া শহরে। মুদ্রণযন্ত্রটি পর্তুগাল থেকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণকালে ক্যাথলিক যাজকরা বিশেষভাবে গদ্যকবিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ওটি খালাস করে নেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে গনজালভেস নামক এক স্পেনীয় কর্মকার তামিল ভাষায় সর্বপ্রথম একপ্রস্থ অক্ষরমালা প্রস্তুত করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল Doctrina Christa নামক এক খ্রীষ্টিয় পুস্তিকা প্রকাশনার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ানদের জন্য ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নাথানিয়েল বি হ্যালহেড বাঙালি পণ্ডিতদের সহায়তায় একটি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন যা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। চার্লস উইলকিন্সই প্রথম বিদেশী,যিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। স্যার উইলকিন্স 'ভাগবতগীতা', 'শকুন্তলার উপাখ্যান' প্রভৃতি অনুবাদ করে গেছেন।

ডাচ্ গভর্ণর কর্ণেল বী কেরী ও মিশনারীদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা, ধর্মপ্রচার, মুদ্রণকার্যে উৎসাহ ও বিভিন্ন সমস্যায় আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গির্জাটি অদ্যাপি শ্রীরামপুরে ডাচ্ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে সগৌরবে বিদ্যমান।

১৯ শতকের উষায়, কেরীর অধিনায়কত্বে গঠিত হয় 'শ্রীরামপুর মিশন'। মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার মধ্য দিয়ে প্রাচ্যজগতে খৃষ্টধর্মের প্রসারণ করা, সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব, চিকিৎসা, বহুভাষায় বাইবেল অনুবাদের দায়িত্ব স্বোপার্জনের দ্বারা সাংসারিক ও এসকল বিষয়ের ব্যয়ভার বহন তাঁকেই করতে হত। কারণ তিনি ইংলণ্ডের ব্যপ্টিষ্ট মিশন থেকে বিশেষ কোন অর্থসাহায্য পেতেন না। এই সকল মহান সৃষ্টিধর্মী কর্মগুলি ছিল তাঁর মত নিবেদিতপ্রাণ মিশনারীর অন্যতম শ্রেষ্ট কীর্তি। বিবাহের বৎসরাধিক কালের মধ্যে তাঁর মরণাপন্ন ব্যাধি হয়, মৃত্যুর সঙ্গে প্রায় বছরখানেক যুদ্ধ চালিয়ে তিনি আরোগালাভ করেন হয়ে পড়েন বিরলকেশী; সেই সময় তাঁদের প্রথম সন্তান এ্যান (কন্যা) একই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষটি ছিলেন অতি খর্বকায়, কিন্তু সর্বমুখী প্রতিভা ছিল তাঁর আকাশচুম্বী, মানবসেবার সর্বক্ষেত্রে উৎসর্গী কৃতপ্রাণ মিশনারীটি ছিলেন ঈশ্বরের একান্তজন।

ভারত ও দেশবিদেশে বহু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী তাঁর পরম সুহৃদ ছিলেন। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন এশিয়া খ্যাত হয়ে ওঠে। এরই সঙ্গে একান্ত প্রকৃতি প্রেমিকরূপে তিনি শ্রীরামপুরে বহু দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষাদি সন্তানস্নেহে লালন পালন করতেন।

শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের বাগান থেকে তাঁর বাসগৃহ পর্যন্ত একটি মনোরম 'ছায়াবীথি' সৃষ্ট হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞানী কেরীর প্রিয় মালী হলধরের সাহচর্যে গড়ে ওঠা এই বীথির গাছপালাগুলির অত্যাশ্চর্য নিপুণতা ও সুরুচিপূর্ণ সজ্জার রোপনকৌশলহেতু এটির নামকরণ হয় 'কেরীর ভ্রমণ-বীথি' (Carey's Walk)।

প্রচারবিমুখ কেরী বিরল বৃক্ষসমূহ তাঁর নামে নামাঙ্কিতকরণের প্রচেষ্টা বহুবার নাকচ করে দেন। অতঃপর তাঁর পরম সুহৃদ ডঃ রক্সবার্গের (বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের অধ্যক্ষ) বিশেষ অনুরোধে কেরীর মত বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সম্মতি প্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি একপ্রকার গুল্মের নামকরণ করেন "Careya"। এজাতীয় গুল্ম তিন প্রকারের শ্রেণীবিভক্ত, যথা ঃ—(১) কেরীয়া হারবাকা, (২) কেরীয়া আরবোরিয়া ও (৩) কেরীয়া স্পায়েরিকা)। সারা বঙ্গদেশ ও ভারতবাসীকে উদ্যানরচনা ও বৃক্ষরোপণে তৎকালে যিনি অনুপ্রাণিত করেন সে নামটি কেরী ব্যতীত আর কেও নয়। এদেশে এসেই তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি যে, কৃষি ও কৃষক এখানে এই কৃষিপ্রধান দেশে সর্বাধিক অবহেলিত—মাত্রাহীন অত্যাচারের শিকার তারা জমিদার ও সরকারের। তজ্জন্য এদেশের কৃষি ও কৃষকদের ও পরোক্ষভাবে কৃষির উন্নতিতে বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে সাহায্য-করণের অভিলাষ ব্যক্ত করে তিনি ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংস ও লেডী হেষ্টিংসের উপদেশ প্রার্থনা করেন এবং তাঁদের সহৃদয় হস্তক্ষেপে ১৮২০ সনে 'এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী অফ্ ইন্ডিয়া' গঠিত হয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সদস্য ছিলেন ডঃ উইলিয়াম কেরী। ১৮৪২ সনে এই সোসাইটী প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনহেতু কেরীর একটি আবক্ষ প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপন করে। তাঁর উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বিশ্বপরিচিতিহেতু তিনি ইংলণ্ডের লিনিয়ান সোসাইটীর, রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাটির ফেলো, এবং Asiatic Society-র সাম্মানিক সদস্য ছিলেন।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বৎসর আগে তাঁর বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা রূপ নেয় "গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক" তথা "কৃষি ব্যাঙ্ক" স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যদ্বারা উপকৃত হতেন গ্রামের চাষী, মজদুর সম্প্রদায়। মধ্যবিত্তদের সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে তাঁর "সঞ্চয় ব্যাঙ্ক" স্থাপন আজও অনুসরণযোগ্য। দেশ ও সমাজ-কল্যাণে আজ আমরা তাঁর সেই পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারছি—আপ্রাণভাবে তার রূপায়ণের ও ব্যাপ্তির জন্য সরকারের ওপর বহু বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি কর্ছি।

১৮০১ সালে কেরী নবপ্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ভাষার শিক্ষক হন—১৮০৬ সালে অধ্যাপক এবং ১৮৩০ সালে বহু ভাষায় বিশেষজ্ঞ ডঃ কেরী ঐ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তরুণ সিভিলিয়ান ছাত্রদের প্রগাঢ় ভালবাসা ও ভারতীয় পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাকরণহেতু তিনি কলেজের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও সম্মানীয় অধ্যাপক ছিলেন। কেরী ৩৯ টী (যদিও এতে মতভেদ আছে) ভারতীয় ভাষায় অভিধান প্রণয়ন করেন—৪৬ টী ভাষার মধ্যে ২৯টী ভাষায় নিজে বাইবেল অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন এবং অবশিষ্টগুলি তাঁর সহায়তায় প্রস্তুত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করার

সাথেই তিনি নিজেকে হিব্রু, ফার্সি, হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, মারাঠি, উড়িয়া, চীনা, পাঞ্জাবী, কানাড়ী, বার্মিজ, তেলেগু, গ্রীক প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং অক্লান্ত, নিরলস পরিশ্রমসহকারে প্রতিটি ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

এর পর থেকেই শুরু হয় 'বাংলাগদ্যের আদিপর্বের' সূচনা। শ্রীমৎ-ভগবৎগীতা ও বেদের অনুবাদ করেন কেরীসাহেব—কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত হয় তাঁরই ছাপাখানায়। 'কথোপকথন' ও 'ইতিহাসমালার গল্প' নামক তাঁর সংকলিত গ্রন্থদ্বয় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বঙ্গদেশকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন মুদ্রিত পুস্তক। ভারতকে তিনি এভাবে নবচেতনায় উদ্ভাসিত করেন। তিনি ছিলেন বাংলাভাষায় প্রাণশক্তির মূলাধার। কেরীর প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ভাষা-সমূহের উন্নতিতে জোয়ার আনয়নের জন্য বহুলাংশে দায়ী।

এসময় একদিকে চলে খৃষ্টের প্রেম, মুক্তি ও ভালবাসার বার্তা প্রচার, অন্যদিকে চলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদকার্য। এই কাজে কেরী নবদ্বীপের বিধবা মহিলাদের কম্পোজিটররূপে নিয়োগ করে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেন এবং তদ্বারা নারীর কর্মপ্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শিত হয়—প্রমাণিত হয় নারীর কর্মকুশলতা ও মূল্যবোধ, সেইসময় সমগ্র রক্ষণশীল ভারতবাসীকে যা তীব্রভাবে সচকিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন কিরূপ ছিল, সেই সংবাদ মহাগুণী কেরী সংগ্রহ করে তাদের সমাজের সৃষ্টিধর্মী কাজে প্রয়োগ করেন—যে কোনও কর্মে নারী যে পুরুষের কাজের সমকক্ষ, এভাবে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেন। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজপতিদের কাছে এটা Himalayan Blunder হ'লেও এটা ছিল নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রমাণদায়ী সরব প্রতিবাদ—কেরী যার পথিকৃৎ। বাংলা ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার অবিস্মরণীয় নাম রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী, যিনি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত করেন লোকমুখে প্রচলিত কথাবার্তা (চলিত বাংলা ভাষা)—প্রবচন ও লোককাহিনী সংগ্রহ এবং সংকলনের মাধ্যমে। যদ্যপি তিনি বিদেশী ধর্মপ্রচারক ছিলেন তথাপি তৎকালীন বঙ্গদেশের জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আপনাকে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন। লোকবিজ্ঞান যে একটি জ্ঞানের জগৎ, চর্চার জগৎ, সেদিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—তিনি বোঝেন, তখন আমাদের জাগবার কাল, জাগাবার কাল—তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল কাজে লৌকিক উপাদানকে ব্যবহার করলেন। বাংলার গ্রাম-জীবন ও গ্রামীণ সমাজ তখনই তাঁর আবেগপ্রবণ মনকে স্পর্শ করেছিল যখন তিনি রামরাম বসুকে নিয়ে বাংলার গ্রাম পরিক্রমায় গ্রামের মানুষদের বিচিত্র কাজ আগ্রহ সহকারে অবলোকন করতেন, নজর করতেন তাদের সরল জীবনযাত্রা,

তাদের মাত্রাহীন সহনশীলতা। বাংলার মাটি-মানুষ-সমাজ-কৃষ্টির অনাবিল প্রাণস্পন্দনটি কল্লোলিত হয়েছে তাঁর ভাবৈশ্বর্য্য ও রসসৌন্দর্যের মাধ্যমে চলিত ভাষার সূত্রপাতকরণের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনার আলোকে। অবচেতন মনে টলষ্টয়ের বক্তব্য "আমাদের সকল সৃষ্টির উৎস নিহিত আছে ঐ জনজীবনের গভীরে" এটাই ছিল কেরীর প্রেরণা।

তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা ১৮১৮ সনের এপ্রিলে সহজ, সাবলীল বাংলা ভাষায় শিক্ষাবিষয়ক মাসিক 'দিগদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন—বাংলার বিভিন্ন স্থানে, গ্রামে-গঞ্জে, সুধীমহলে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয় যে মিশনারীদের কাছে তা অকল্পনীয় ছিল। ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে প্রথমে সংবাদপত্র প্রকাশ না করে তাঁরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় সহকারে সংঘাতের পথ পরিহার করে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই পত্রিকাটির প্রকাশনা সাফল্যের সঙ্গে শুরু করেন। এর প্রকাশনা গ্রামজীবনে গতিশীলতা আনে, প্রকাশিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি অত্যাধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে গ্রামের মানুষের পরিচয় করায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—বিশ্বে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা ২,৭০০ (উপভাষার সংখ্যা ব্যতিরেকে)। ভাষার প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে ঐ কয়েক হাজার ভাষাই 'ভাষা' অর্থাৎ মনোভাব প্রকাশের বাক-বাহন। তথাপি ভাষা-তাত্ত্বিকদের নিকট ১৩টি ভাষাই কেবলমাত্র অগ্রগণ্য। এই ১৩টি ভাষা যথাক্রমে (১) চীনা, (২) ইংরাজী, (৩) হিন্দুস্থানী—হিন্দী এবং উর্দুসহ, (৪) রুশী, (৫) স্পেনীয়, (৬) জার্মান, (৭) জাপানী, (৮) ফরাসী, (৯) ইন্দোনেশীয়, (১০) পর্তুগীজ, (১১) বাংলা, (১২) ইতালীয় ও (১৩) আরবী। উল্লিখিত তেরটি ভাষা কেবলমাত্র তেরটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়—এদের মধ্যে কয়েকটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রসারলাভ করেছে।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কেরীর মন্তব্য ছিল—"বাংলা ভাষা মাধুর্য্য ও প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরপুর"। কেরী পরম তৃপ্ত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ভাবোন্মেষে—বাংলাভাষা তাঁর নিঃস্বার্থ সাধনার পরম লাভ, কারণ সরকারী অনুমোদন ব্যতিরেকেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসাবে তা বিশ্ববন্দিত ও সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে পরিগণিত হয়—পরম কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা সমাজকে জাগাতে সক্ষম হয়ে সত্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিষ্ঠাবান কেরী পরিতৃপ্ত হন, যখন দেখেন সমাজ নিদ্রোত্থিত হয়েছে। মিশনারী ঋষিপ্রতিম কেরী চিরনবীনতার আহ্বান জানিয়ে যান।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র প্রকারের পত্রপত্রিকা শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮০৭ থেকে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। যথা—(১)Circular Letter, ইংরাজী মাসিক (১৮০৭—১৭), 'বিবরণাদি' ধরণের, (২) মেময়ার অফ্ ট্রানশ্লেশন, ইংরাজী বার্ষিক 'বিবরণাদি' ধরণের (১৮০৭-৩২),

(৩) পিরিয়ডিক্যাল এ্যাকাউন্টস্, ইংরাজী বার্ষিক, 'বিবরণাদি' ধরনের (১৮১৫—৩২), (৪) দিগদর্শন, (১৮১৮—২১) বাংলা মাসিক, 'শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি ধরণের (৫) ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া, (১৮১৮-২৮) ইংরাজী মাসিক, 'শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানাদি' ধরনের, (৬) সমাচার দর্পণ (১৮১৮-৪১) বাংলা সাপ্তাহিক 'সংবাদপত্র'. (৭) দিগদর্শন (১৮১৯), মাসিক হিন্দী, 'শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকা, (৮) দিগদর্শন (১৮১৯-২১), ইংরাজী ও বাংলা 'শিক্ষা' সংক্রান্ত পত্রিকা, (৯) খৃষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি (১৮২০), 'ধর্মীয় ঈশতাত্বিক' বাংলা মাসিক পত্রিকা, (১০) আখাবারে শ্রীরামপুর (১৮২৬), ফার্সী সাপ্তাহিক 'সংবাদপত্র', ও (১১) ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া (১৮৩৫-৭৫), সাপ্তাহিক ইংরাজী 'সংবাদপত্র'। 'ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে এই মিশনারীরাই রাজা রাম-মোহনের বিশ্ব পরিচিতি করিয়ে দেন—কেরী সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেন যে নতুন সমাজের নেতৃত্বভার নিতে এই তেজস্বী মনীষীর আবির্ভাব। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রৌঢ় কেরী শ্রীরামপুর মিশনালয়ে রামমোহনকে মহাসমাদরে আমন্ত্রণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে তাত্ত্বিক বিরোধ উপস্থিত হওয়া সত্বেও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এঁরা সদাসর্বদা একত্রিতভাবে কার্য সমাধা করেন।

১৮০৭ সালে আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটি কেরীকে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্ম প্রয়াসের সফলতার জন্য 'সাম্মানিক ডক্টর অফ্ ডিভিনিটি' (D.D) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ভারতীয় সমাজে দুষ্ট ক্ষতের মত 'ভাষাবিরোধ' আজও সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান, এর কারণ শিক্ষাবিদ্ কেরীর বঙ্গভাষার সমন্বয় সাধনের প্রয়াসকে আমাদের সম্যক্ উপলব্ধি না করতে পারার অক্ষমতা এবং তাঁর অসম্পূর্ণ কর্মের সম্পূর্ণীকরণের দায়িত্বহীনতা। স্বার্থান্বেষী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, দেশীয় জমিদার, ধনবান, প্রতিপত্তিশালী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, মৌলবী প্রভৃতির মিথ্যা অপবাদ, অত্যাচার, অসহযোগিতা, নিগ্রহ সত্বেও ভারতবন্ধু কেরীর প্রেরণা প্রায় ২০০ বৎসর আগে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণে' কিভাবে দৃঢ়ীভূত ঐশ্বরিক সত্য ও আশীর্বাদে পরিণত হয়েছিল, আজ আমরা সবেমাত্র তা উপলব্ধি করতে পারছি। সামান্য কণামাত্র 'নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন সূচী' আমরা ঢক্কানিনাদে, যাবতীয় উন্নততর অত্যাধুনিক প্রচার মাধ্যমে দেশময় প্রচার করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। কিন্তু সেনাপতি আচার্য কেরী তৎসহ তাঁর একনিষ্ঠ যোদ্ধারা—জশুয়া ও হানা মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন ফাউন্টেন্, ড্যানিয়েল্ ব্রান্সডন্ এদেশে সকল কাজে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবার মহাকল্যাণের নিমিত্ত জয়ী হয়ে ঈশ্বরের মহৎ আজ্ঞা 'প্রতিবেশীকে প্রেম কর' (Love thy neighbour) কাজের মধ্য দিয়ে সফল করে গিয়েছেন। তাঁদের বিজয় কেতন ওড়ানোর গান "অগ্রসর হও আজি

খৃষ্টসেনা সব (Onward Christian Soldier) আমরা তাই দৃপ্তভঙ্গীতে গাই। নিজেদের কায়েমী স্বার্থহানি হওয়ার আশঙ্কায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেরীর ন্যায় মহান ও সত্যনিষ্ঠ ঈশ্বরের সেবককে তাদের সাম্রাজ্যে ধর্মপ্রচার করার ও অন্যান্য কাজ করার অনুমতি না দিলেও কেরী তাঁর নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণের যে বীজ প্রোথিত করেছিলেন, তা চিরস্মরণীয়।

আচার্য ডক্টর কেরী সম্পূর্ণ এদেশীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে যান শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর কলেজ। ১৮১৮ সালের ১৫ই আগষ্ট মাত্র ৩৭ জন ছাত্র নিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শ্রীরামপুর কলেজ চালু করেন। মাতৃভাষাই শিক্ষার একমাত্র এবং প্রকৃত মাধ্যম—তিনি শ্রীরামপুর স্কুল ও কলেজে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচলিত ক'রে এর যথার্থতা প্রমাণিত করেন।

এর পর প্রাচ্যের সুরম্য কলেজভবনগুলির অন্যতম শ্রীরামপুর কলেজের নবনির্মিত ভবনের শ্রেণীগুলিতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে—দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঈশতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষ দান শুরু হয়। ১৫ই জুলাই, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিদ কেরী এই কলেজের 'পরিচয়পত্র' দিনেমার গভর্ণর ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ গভর্ণর জেনারেল দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেন। এই কলেজের প্রথম 'গভর্ণর' হ'ন ডাচ্ রাজ্যপাল বী ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'ন বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস।

পারিবারিক জীবনে মহামতি কেরী ছিলেন পরম সহিষ্ণু, আদর্শ স্বামী ও স্নেহশীল পিতা। ১৮২১ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেলিক্স, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মিসেস শার্লোট কেরী, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ডের (কেরীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ) পরলোকগমনে বৃদ্ধ কেরী ও মার্শম্যান্ তাঁদের অবর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা সম্পর্কে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন। কলেজটি যাতে অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে একান্তভাবে তার শিক্ষার বিশেষত্ব ও ভারতীয় আদর্শে প্রবর্তিত শিক্ষাধারার প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান রাখতে পারে, সেজন্য মার্শম্যান শ্রীরামপুর কলেজের সনদ পেশ করণার্থে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের রাজদরবারে আবেদন পেশ করেন। কেরী ও তাঁর স্বদেশীয় এবং ভারতীয় ভ্রাতৃসম সহকর্মীদের নর-নারায়ণের কল্যাণকর্মে অতীব মুগ্ধ ও প্রীত হয়ে শ্রীরামপুর কলেজকে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক 'রাজকীয় সনদ' (Royal Charter) প্রদান করে মহাত্মা কেরীর 'নবনালন্দা' গঠনের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মার্শম্যান রাজকীয় সনদসহ শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সনদবলে শ্রীরামপুর কলেজ 'ডিগ্রী' প্রদানের ক্ষমতা লাভ করে এবং

এশিয়ায় সর্বপ্রথম সূচনা হয় ইউরোপীয় ধাঁচের 'মহাবিদ্যালয়'।

নতুন কিছু করতে গেলেই চিরকালের নিয়মানুযায়ী রক্ষণশীলেরা তাঁকে বাধা দেবেন একথা তাঁর অবিদিত ছিল না—হিন্দু সমাজের যুগযুগান্তের অনাচার ও অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর কাজ যে বিরাট প্রতিবাদস্বরূপ—এর ফল যে সুদূরপ্রসারী—প্রতিপক্ষ তা বুঝতেন। তাঁকে দেখে মনে হ'ত যেন স্বয়ং অটুট সঙ্কল্প পাহাড়শিখরে শির উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর কাছে মানুষই ছিল সম্পদ—দৃঢ়তা, সৎসাহস, মমত্ববোধের সঙ্গে মূল্য-বোধের সামগ্রিক অবক্ষয়/দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি এগিয়ে চলতেন তাঁর গগনচুম্বী কর্মপ্রতিভা নিয়ো মানবদরদী কেরী সাহেবদের মত সৎ খৃষ্টানরাই শত নির্যাতনের মধ্যেও Heathen-দের হিতসাধন করে গিয়েছেন, যার সুফল আজ আমরা ভোগ করছি। 'খৃষ্টীয় প্রেম' (Christian Love) সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি তারই সুফল। তিনি বপন, রোপন, পত্তন করে-ছিলেন—মণ্ডলীর নবায়ন করতে চেয়েছিলেন—প্রচেষ্টা করেছিলেন "দীন মণ্ডলী"—"Home Church" প্রতিষ্ঠার। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন ভারত প্রেমিক কেরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ও শ্রীরামপুরে তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত হয়।

কেরী তাঁর সমাধিফলকে "একটি ক্ষুদ্র কীট, তোমার সদয় ক্রোড়ে আশ্রয় চায়" এই কথাটি উৎকীর্ণ করে রাখার অনুরোধ রেখে যান। তিনি মনে করিয়ে দিয়ে যান—আমার মর্মরমূর্ত্তি স্থাপন করে, বা আমার কথা বলে, ধর্মীয় উপদেশাবলীকে কেবলমাত্র মূল্যবান পাথেয় করে রেখোনা। আমার স্বর্গস্থ পিতার কথা বোলো। শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গেলাম। সেই শিক্ষার আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখে আমাকে/আমাদের স্মরণীয় করে রেখো।

রেভারেণ্ড ডক্টর কেরীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জর্জ হাওয়েল ডাচ রাজার সনদকে পুনরুজ্জীবিত করে "এশিয়ায় প্রথম ঈশতত্ত্ব শিক্ষার মহাবিদ্যালয় গঠন করেন। এবং তৎসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কেরীর আশীর্বাদপুষ্ট কলেজে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা সংগঠন করেন। এভাবেই তিনি আমাদের প্রতিটি আগামী প্রজন্মের মধ্যে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন, 'কেরী জ্যোতি' বঙ্গদেশ তথা ভারতে চিরঅনির্বাণ থাকবে কারণ তিনিই গড়ে গিয়েছেন 'মানুষের মহাভারত'।

উপনিষদ্ না পড়লে যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মার্থ বোঝা যায় না, তেমনি টলস্টয়ের উক্তি 'আমাদের সকল সৃষ্টির উৎস নিহিত আছে ঐ জন-জীবনের গভীরে' এই কথা হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি না করতে পারলে ভারত-বন্ধু কেরীর 'মানুষের মহাভারত' সৃষ্টির দর্শন আমাদের বোধশক্তির অন্ত-রালেই চিরদিন থেকে যাবে।

॥ মডেল নং—বিরানব্বুই

রঞ্জিত রায় চৌধুরী*

[মঞ্চে একদল গাইয়ের প্রবেশ এবং গান]

তোর তিনশো বছর বয়স হতে—
হল-কতনা ধুমধাম।
কালীক্ষেত্র—কলিকাতা
তোরে জানাই যে সেলাম ॥
যবে বাবু বিবি সেজে লোকে
খেলো সুতানুটীর ভোজ
যে জন কাঁদে অনাহারে
তাদের রাখলো কি আর খোঁজ ॥
মস্তমেলা—হল খোলা
সেথা জুটলো-জ্ঞানীগুণী
সেই ভিড়েতে তবু—
কেরীরা নাম না শুনি ॥
তোরে নিয়ে যত আশনাই—
বাবুদের অন্তরে—
সেই বাঙালী বাবুরাই বা
ভুললো কেমন করে ?
পাদ্রী কেরী, সাধু কেরী
যে কেরী লেখেন ব্যাকরণ
শিশু বলি বন্ধ করান
করেন, নানা দুঃখ নিবারণ ॥
বাংলা হরফ গড়ান, ছাত্র পড়ান—
খোলেন প্রথম ছাপাখানা।
সেই মানুষের জীবনচরিত—
হেথা শুনতে বুঝি মানা ?
কলকাতা তোর—একি হল—
কেন মন্দ এমন মতি ?

---

* রঞ্জিত রায় চৌধুরী একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও উইলিয়াম কেরী স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেণ্টারে কর্মরত।

[গাইয়ের দলই মঞ্চসজ্জার জিনিষপত্র নিয়ে দৃশ্যে প্রবেশ করে এবং গান চলাকালীন যতদূর সম্ভব জিনিষপত্রগুলোকে সাজিয়ে রাখে। দলটি গান শেষে চলে গেলে দেখা যায়—মঞ্চের এক কোণে একটি কাউণ্টার, তার এক পাশে কয়েকটি চেয়ার পাতা। সম্ভবপর ক্ষেত্রে একটি ছোট বেঞ্চও থাকতে পারে। মূল দৃশ্য যখন আরম্ভ হবে তখন কাউণ্টারের একপাশে দাঁড়িয়ে অমিয়কান্তি ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলছে]

অমিয় : [ফোনে] আপনি গ্যালারীর দরজা খোলা হবে না বলছেন—কী তাইতো? কারণটা জানতে পারি কি? চাবি হারিয়ে গেছে। এ্যবসার্ড ! দেখুন—পাঁচদিনের জন্য আমরা গ্যালারীটা ভাড়া নিয়েছি···কাজেই। আপনি জানেন বেলা দুটো নাগাদ মাননীয় মন্ত্রী প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে আসছেন। কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যে দরজাটা খোলা না হলে—আমরা তালা ভাঙ্গতে বাধ্য হবো।

বেশতো—থানা পুলিশ হলে হোক। তাহলে আমরা পাবলিককে বলতে পারবো—আপনার মতো মানুষেরা কি চিজ !

[এই সময় কাচুমাচু মুখ করে একটি যুবক দৃশ্যে প্রবেশ করে। তাকে দেখে শ্যামল এগিয়ে যায়। ইশারায় বসতে বলে]

হ্যাঁ, একে ভয় দেখানো ভাবলে—আমি নাচার। তালাটা তাহলে ভাঙ্গতেই হচ্ছে ! রাবিশ [বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে অমিয়]

শ্যামল : কি হবে গো, অমিয়দা !

অমিয় : শুনলিতো তালা ভাঙ্গা হবে।

শ্যামল : শেষ পর্যন্ত···।

অমিয় : শেষের এখন কোথায় কি। এতো সবে শুরু। শোন, যে করেই হোক একজন ওস্তাদ চাবিওয়ালা ধরে নিয়ে আয়। যত টাকা লাগে দেওয়া যাবে।

শ্যামল : যদি না পাই !

অমিয় : পেতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করতে আসছেন। শহরের তাবৎ জ্ঞানীগুণীরা নিমন্ত্রিত। গ্যালারী খুলবোনা—বললেই হ'ল !

শ্যামল : লোকটা যদি এ নিয়ে থানা পুলিশ করে।

অমিয় : আগে করুক। তারপর দেখা যাবে। যা, সময় নষ্ট করিস না।

শ্যামল : বেশ ; একটা লোক ব্যাজ আর কিছু ছাপা কাগজ নিয়ে আসবে, দেখে নিও। [প্রস্থান]

অমিয় : আর ব্যাজ ! [সামান্য সময়ের জন্য চিন্তিত] আশ্চর্য, চাবিটা হঠাৎ লোকটা লুকিয়ে রাখবেই বা কেন? কিন্তু···। সব চাইতে অবাক ব্যাপার হলো—লোকটার গলায় এতটুকু সংকোচ বা দুশ্চিন্তা ছিলনা !

[হঠাৎ অপেক্ষারত যুবকের কথা মনে পড়তে]

ওঃ ! আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, বলুন !

যুবক : আমি দামাল পত্রিকার পক্ষ থেকে এসেছি।

অমিয় : [স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে] যাক—অন্ততঃ একটা ভালো খবর নিয়ে এসেছেন। ঠিক সময়ে পত্রিকাটা প্রকাশ করেছেন। দুঃসময়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যুবক : দেখুন··· ।

অমিয় : যে লেখাগুলো আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছেন সেগুলোর সবকটা ছাপাতে পারেননি, কি তাইতো। যে কটা ছেপেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কই—পত্রিকাটি কেমন হ'ল দেখি।

যুবক ঃ এরকম একটা মহৎ উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পেরে আমরা গর্বিত। কিন্তু যে ছাপাখানায় পত্রিকাটা ছাপছিলাম আমরা, সেখানে কাজটা করা গেল না !

অমিয় ঃ মানে ! !

যুবক ঃ বললো আর্জেন্ট কাজ, বেশী রেট দিতে হবে। আসলে খুব বড় একটা অর্ডার পেয়েছে তাই··· ।

অমিয় : তার অর্থ হলো—দামাল বিশেষ সংখ্যা আজ প্রকাশিত হচ্ছে না ! কি তাইতো ?

যুবক : হচ্ছে। তবে, সংক্ষিপ্ত আকারে। এবং এভাবে চললে বুঝলেন, আমাদের মতো লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে কাগজের এবং ছাপার দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

অমিয় ঃ দেখুন—দেশের মুদ্রণ সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার মতো মনের অবস্থা আপাততঃ নেই। সোজা কথাটা বলুন তো। পত্রিকা যদি আজ প্রকাশিতই হচ্ছে তাহলে হঠাৎ এখানে হাজির হয়েছেন কেন ?

যুবক : আসলে আপনাদের পাঠানো প্রবন্ধগুলোর একটার শেষ প্যারাগ্রাফটা ছাপা সম্ভব হয়নি। অথচ, ওটা খুবই মূল্যবান প্রবন্ধ। তাই বলছিলাম ঐ লাইন কটা কি বাদ দিয়ে দেবো ?

অমিয় : বাদ দেবেন ? কিন্তু··· ।

যুবক : আমি কি বাদ দেওয়ার অংশটা পড়ে শোনাবো। আপনি রাজী হলে, আমরা পত্রিকাটি বাঁধিয়ে বিকেল নাগাদ হাজির হতে পারি। [ফোনটা বাজে। অমিয় ব্যস্ত হয়ে রিসিভার তোলে]

অমিয় : কি, চাবিওয়ালা খুঁজে পাচ্ছিস না ? বোগাস ! না, না, আমি কোন কথা শুনতে রাজী নই। যে করেই হোক, একটা চাবিওয়ালা ধরে আন। প্লিজ, শ্যামল ! [রিসিভার রেখে দেয়] যা শুরু হয়েছে—আমার

মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে যাবে। এত বড় একটা সেলিব্রেশন। অথচ চারদিক থেকে বাধা বিপত্তি…।

যুবক : [পরিস্থিতি বুঝে] আমি বরং যাই।

অমিয় ঃ আর ডুবাবেন না মশাই। নিন, কি পড়তে চান পড়ুন। বেশী সময় নেবেন না—প্লিজ।

যুবক ঃ [নাটুকে গলায়]

পুণ্য লাভের লোভে শিশু সন্তানকে নদীর জলে নিক্ষেপ করার মতো প্রচলিত ধর্মীয় কুপ্রথা দূর করার জন্য মহাত্মা উইলিয়াম কেরী যে আন্দোলন আরম্ভ করেন, মূলতঃ তারই ফলশ্রুতি এই প্রথাকে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়।

আজ দুশো বছরের কাছাকাছি সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যখন আমরা দেখি গোটা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ শিশু শ্রমিক প্রতিদিন প্রাণপাত করছে—তখন বুঝতে পারি এতকাল পরেও কেরীর প্রাসঙ্গিকতা আমাদের জীবন থেকে শেষ হয়ে যায়নি। সেকালে যা হতো ধর্মের নামে, একালে তাই ঘটছে—অর্থনীতির অঙ্গ হিসেবে'। [যুবক থামে]

অমিয় ঃ এই অংশটা বাদ দেবেন ?

যুবক ঃ বুঝতেই পারছেন…।

অমিয় ঃ এটাই তো জরুরী প্যারাগ্রাফ, অসম্ভব। এ কি করে বাদ দেবেন ?

যুবক ঃ কিন্তু…।

অমিয় ঃ বেশ—আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। অনুগ্রহ করে আমাকে রেহাই দিন। আমি হাত জোড় করছি…।

যুবক বিব্রত বোধ করে উঠে দাঁড়ায় এবং 'দেখি কি করা যায়' বলতে বলতে প্রস্থান করে।

অমিয় : [স্বগত] হঠাৎ করে নাট্যকার লোকটা কেন যে ঐ দামাল পত্রিকার প্রসঙ্গটা আনলো ?

[নাট্যকারের প্রবেশ]

নাট্যকার : কি ব্যাপার অমিয়কান্তি। নাট্যকারকে তলব ?

অমিয় : [ব্যস্ত ভাবে] না, আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম আপনি হঠাৎ করেই কেন—এই সিকোয়েন্সটা তৈরী করলেন।

নাট্যকার : দুটো পারপাস্ ছিল। একটা তোমাকে আরো সমস্যার মধ্যে টেনে নেওয়া। সেটা তো সফল হয়েছে বুঝতেই পারছো। দ্বিতীয় কারণটা ছিল এই সুযোগে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের প্রায় দুশো বছর পরে কিভাবে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে, তার আভাস দেওয়া।

অমিয় ঃ দেখুন—পঞ্চানন কর্মকারের হাতে কাটা হরফ দিয়ে যার শুরু, তা

এখন পি, টি, এস বা ওয়ার্ড প্রসেসারে করা সম্ভব ; এটা মুদ্রণ শিল্পের চূড়ান্ত অগ্রগতির প্রমাণ।

লেখক : অগ্রগতির ব্যাখ্যাটি গোলমেলে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে ক্রমশ ট্রাডিশানাল মুদ্রণের জগৎ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে কিছু ছাপানো ব্যয়সাধ্য। ফলে ছোট খাটো পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তোমার ঐ অগ্রগতিকে কাজে লাগাতে পারবে কেবল বাণিজ্যিক উদ্যোগ-গুলো, শেষ পর্যন্ত গুটি কয় কোটিপতির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে মুদ্রণ-শিল্প। তারাই তখন শিল্প, সাহিত্য এই সব কনট্রোল করবে। ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু প্রমাণ জুটছে। কাজেই…[লেখক চলে যায়] [অমিয় [ত্রস্তভাবে] 'আরে শুনুন। শুনুন'…বলতে বলতে লেখকের পিছু পিছু চলে যায়। শূন্য মঞ্চে একজন গায়েন, একজন জমিদারের পোশাক পরা লোক ও একজন মুসলমান রায়ত ঢোকে]

॥ গান ॥

শ্রীরামপুরে এয়েচে এক সাহেব সন্নেসী।
ধর্ম-কথা বলতে এসে,
সাহেব কিনা মজলো শেষে
মোদের কথা শেখার কাজে,
জেনে—মোদের পায় যে হাসি
সাহেব কলের চাপে—ছাপে কতা –
ঘুরে বেড়ায় যথা তথা—
গরীব জনের সঙ্গে যে তার—
যতেক মেশামেশি ॥
শ্রীরামপুরে এয়েচে এক সাহেব সন্নেসী ॥

[গোলমাল শুনে অমিয় ঢোকে]

অমিয় : হচ্ছেটা কী ? বলি এটা কি যাত্রার আসর ?

গায়েন : নাগো না, এ হলো জাগালীর আসর।

অমিয় : এক্ষুনি বিদেয় হও।
যাও।

গায়েন : থাকতে আসিনি গো ছেলে। আমাদের নক্সাটা আগে হোক।

অমিয় : নক্সা ?

গায়েন : নক্সা নয় তো কি। বলি নাটকের মাঝে মাঝে নক্সা থাকবে, তবে না। কৈ গো, তোমরা শুরু করো।

জমিদার : [গায়েনকে] কেমনরে রমজান, এ বেটা কি বলে ? তুই দেখিয়াছিস ?

গায়েনরূপী রমজান : মহাশয় সে জানিনে, বিস্তর তরদ্বুদ্ করিয়াছিল তাহা জল হইল না কি করিবে ?

জমিদার : ভাল—তুই করার লিখিয়া দে, কয় রোজ বাদে টাকা দিবি।

রমজান : যে আজ্ঞা মহাশয়। করার লিখিয়া লউন, দশরোজ্ পরে টাকা না দেই তো পেয়াদার রোজের কড়ি দিব।

জমিদার : দশ রোজ দেরি হইতে পারিবে না, পাঁচ রোজের করার লিখিয়া দে।

রায়ত : মহাশয় পাঁচ রোজের মধ্যে সুসার করিতে পারি—আমার এমন বেহেবুদ কি। দোহাই মহাশয়ের দশদিনের আজ্ঞা হউক।

জমিদার : আরে এ বেটা বড়ই কৈফিয়ৎওয়ালা ইহাকে সুন্দর রূপে সাজা না দিলে খাজনার টাকা দিবে না।

রায়ত : যাহা করুন কর্তা মহাশয়। এখন বড় লাচারিতে পরিয়াছি।

[তিনজনেরই প্রস্থান]

অমিয় : ওঃ। এতো ভূতের কেত্তন !

[লেখকের প্রবেশ]

লেখক : ভূত না বলে ব্রহ্মদৈত্যের খেলা বলাই সমীচীন হবে হে অমিয়কান্তি। মহাত্মা উইলিয়াম কেরী যে বছর কোলকাতায় পৌঁছল, মানে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, সে বছরই বিদেশী শাসককুল কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে। বাংলার কৃষকের সর্বনাশ সেই সময় থেকেই। গত দুশো বছরে—সেটাই গোটা দেশ জোড়া কৃষককুলের অবস্থা। এবং আজো বহুক্ষেত্রেই এর অদলবদল হয়নি। শুধু জমিদারের স্থান নিয়েছে—জোতদার, মহাজন, মুৎসুদ্দি আর দালালেরা।

অমিয় : কিন্তু এই মাত্র যে একটা নক্সা হল, তার ভাষা ?

লেখক : ওটাই বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। কেরী তাঁর সহকারীদের সাহায্যে 'কথোপকথন' গুলো সংগ্রহ করেন।

অমিয় : তার সঙ্গে আজকের প্রদর্শনীর সম্পর্ক কোথায় বলবেন কি ?

লেখক : আহা, ঐ কথোপকথনকেই তুমি প্রথম বাংলা নাট্যগ্রন্থ হিসেবে মেনে নাও, তাহলে আর গোল থাকবে না। [লেখক চলে যায়]

অমিয় : গোল থাকবে না ! যে গণ্ডগোল পাকিয়েছে, সেটা সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছি···।

[হঠাৎ একজন মৌলবী ও পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে]

অমিয় : ওখানে কে ? কি চাই আপনাদের ?

[পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রবেশ]

পণ্ডিত : আমরা উপস্থিত হলাম।

অমিয় : সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন ?

পণ্ডিত : [মৌলবীকে] আরে, এ তো দেখি গুরুমশায়ের মতো জেরা করে হে।

মৌলবী : দিন না দুটো কঠিন শ্লোক ঝেড়ে !

পণ্ডিত : না না, হাজার হোক তুমি সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি, তুমিই আরম্ভ করো।

মৌলবী : আল্লার কিরে দিয়ে বলো তো আমাদের চিনতে পাচ্ছো না !

অমিয় : আপনারা কি দর্শক ? মানে প্রদর্শনী দেখতে…?

পণ্ডিত : নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে আর দিলে কোথায় বাছা।

অমিয় : দেখুন প্রদর্শনীটা নিয়ে একটা সমস্যা তৈরী হয়েছে।

মৌলবী : হয়েছে ! হতেই হবে। তোমরা কায়দা করে দেশের পণ্ডিত আর মৌলবীদের বঞ্চিত করবে। সমস্যা হবে না।

পণ্ডিত : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, একেই বলে।

মৌলবী : আমরা খবর পেয়েছি—পাদ্রী কেরীকে নিয়ে খুব হৈ চৈ আরম্ভ করেছেন আপনারা।

পণ্ডিত : হট্টগোলই বলা বিধেয়।

অমিয় : এসব কি বলছেন ?

পণ্ডিত : আপনারা পাদ্রী সাহেবকে নিয়ে একটা প্রদর্শনী করছেন ?

অমিয় : ঠিকই শুনেছেন।

মৌলবী : তা পাদ্রী মহাশয়ের জয়গান করতে গিয়ে—আমাদের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি ! একে কি আমরা ধর্মীয় বৈষম্য বলবো না !

পণ্ডিত : বৈষম্য বলে বৈষম্য।

অমিয় : উপযুক্ত স্থানে আমরা আপনাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছি। ধরুন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্ব ! সেখানে এমন কি আপনাদের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে।

পণ্ডিত : আপনি যে সত্যি কথা বলছেন—তার প্রমাণ ?

অমিয় : কেন প্রদর্শনী !!

মৌলবী : বহুৎ আচ্ছা। চলুন একবার সেটা নিজের চোখে দেখে আসি।

অমিয় : দেখবার জন্যেই তো করা। কিন্তু মুশকিল হল…।

পণ্ডিত : মুশকিল ! আরে আমরা থাকতে চিন্তা কি। আমরা দুজনায় মিলে, শাস্ত্র আউড়ে স্থানটাকে পবিত্র করে দেবো।

অমিয় : আপনাদের অশেষ কৃপা। কিন্তু, আসলে কি জানেন, যে ঘরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে, তার চাবিটা হারিয়ে গেছে।

পণ্ডিত : বটে ! বুজরুগির আর জায়গা পাওনি।

মৌলবী : আমাদের তুমি কাঁচা আবু* পেয়েছো ?

---

* 'আবু' মানে শিশু

অমিয় ঃ আপনারা মান্যগণ্যজন। বলুন না। ঐ হল মালিক ব্যাটা সকাল থেকে নানা কায়দা করছে—লোকটাকে একটু কড়কে দিন না। আমি ফোনে লাইনটা ধরে দিচ্ছি।

পণ্ডিত ঃ রোসো বাছা। আমাদের দিয়ে নিজের ঝগড়াটা সেরে নিতে চাও? ওসব চালাকিতে আমরা ভুলছিনা।
আমরা ভেতরে প্রবেশ করে সব নিজের চোখে দেখতে চাই।

অমিয় ঃ এই মুহূর্তে তা অসম্ভব।

মৌলবী ঃ পণ্ডিতমশাই—আমাদের সিদ্ধান্তে অচল থাকতে হবে।

পণ্ডিত ঃ অবশ্য। কোনো রকম ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব হতে দেওয়া চলবে না। আমরা বরং দরজা খোলার জন্য কোথাও অপেক্ষা করি।

[দুজনার প্রস্থান]

অমিয় ঃ ওঃ একের পর এক উৎপাত। আর সেসব কিছু আমাকেই সামাল দিতে হবে! দশ দশটা মিটিং করে জনে জনে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল। অথচ কাজের সময় দেখো কেউ নেই। শ্যামল, সেও চাবিওয়ালা খোঁজার নাম করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে হয়তো!
[এই রকম সময়—চিন্তিত মুখ, শ্লথ গতি—রূপা দৃশ্যে প্রবেশ করে]

অমিয় ঃ [ব্যঙ্গ] থাক, তবু মনে পড়েছে! কত করে বলেছি—সকাল সকাল তোরা দু-তিনজন চলে আসবি। কাউণ্টারটা সামলাবি। ফোন এলে এ্যটেণ্ড করবি!
সব দায় বুঝি আমার? যা, কাউণ্টারে বোস। আমি একটু চা খেয়ে আসি। [রূপা কোন শব্দ করছে না লক্ষ করে] কি ব্যাপার? বোবা মেরে গেছিস, মনে হয়!
[রূপা কান্না জড়ানো গলায়]

রূপা ঃ অমিয়দা আমি এরপর থেকে ··।

অমিয় ঃ কি হয়েছে বলবি তো?

রূপা ঃ হুট হট করে বাড়ির বাইরে আসি বলে বাবা খুব বকেছে আজ।

অমিয় ঃ হঠাৎ?

রূপা ঃ আসলে বাবা কদিন ধরেই কলেজ ছাড়তে বলছেন!

অমিয় ঃ কেন?

রূপা ঃ বলছেন—মেয়েদের অত পড়াশোনা দিয়ে কি হবে। সেইতো পরের ঘরে গিয়ে খুন্তি নাড়তে হবে।

অমিয় ঃ তাই বলে পড়াশোনা করবে না?

রূপা ঃ বাবা বলেছে, আমার জন্য যে টাকা খরচ হয় তা দিয়ে পল্টুকে কম্পিউটার শেখার ক্লাশে ভর্তি করবে।

অমিয় ঃ পল্টু! সে তো তোর ছোট?

রূপা ঃ তবু পল্টু ছেলে। অমিয়দা, মেয়ে হয়ে জন্মানো কি পাপ ? [কান্না]

অমিয় ঃ কে বলেছে তোকে এসব ? নে, চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। এসব চুকে যাক, আমি মেশোমশায়ের সঙ্গে কথা বলবো। [রূপা বাইরে যায়]

[লেখকের প্রবেশ]

অমিয় ঃ আপনি আবার ঢুকেছেন ? নাটকে তো এখানে আপনার প্রবেশ লেখেননি আপনি !

লেখক ঃ একজন লেখকের এই হল সুবিধা, অমিয়কান্তি। তাছাড়া এই মারাত্মক ভুলকে তো মেনে নেওয়া যায় না।

অমিয় ঃ ভুল !

লেখক ঃ ভুল হলো তোমার ঐ ধারণায়। এ সমাজের অনেক মেসোমশাই-ই মনে করেন, স্ত্রী শিক্ষা অনর্থক ! প্রায় দুশো বছর হতে চললো, প্রথা-মতো নারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহাত্মা কেরী এমনকি মেয়ে-স্কুলের পর্যন্ত পত্তন করেছিলেন সেকালে। সেদিনও যেমন তোমার ঐ তথাকথিত মেসোমশাই পিসেমশাই'র দল বিশ্বাস করত কেরীর ঐ উদ্যোগ অর্থহীন, আজও তা সমাজে সমান ভাবে প্রচলিত। কাজেই রূপার মতো মেয়েদের চোখের জল ফেলতে হয়।

[এইখানে রূপা প্রবেশ করে। লেখক চলে যায়]

রূপা ঃ আমায় নিয়ে ঝগড়া হল বুঝি ?

অমিয় ঃ নারে পাগলি। শোন, তুই একটু সামলে দে। আমি চট্ করে এককাপ চা খেয়ে আসছি।

[যাওয়ার জন্য উদ্যোগ করতে]

[সাংবাদিকের প্রবেশ]

সাংবাদিক ঃ [অমিয়কে থামিয়ে দিয়ে] চা না হয় দুজনে মিলেই খাওয়া যাবে মিঃ মিত্র।

অমিয় ঃ আপনাকে তো…!

সাংবাদিক ঃ চেনেন না ? আমিও আপনাকে নামে চিনি। আপনিই তো অমিয় কান্তি মিত্র।

অমিয় ঃ হ্যাঁ, পিতৃদত্ত নাম। তবে সারা সকাল যা চলছে তাতে পিতার নামই বোধহয় ভুলে যাবো।

সাংবাদিক ঃ তাই নাকি ! আমি সান্ধ্য দৈনিক পালাবদলের পক্ষ থেকে এসেছি।

অমিয় ঃ দেখুন—আমরা একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনা-দের ফেভার দরকার।

সাংবাদিক ঃ বেশতো বলুন।

অমিয় ঃ আমরা প্রদর্শনীর মালপত্রগুলো যে রুমে কাল রাতে সাজিয়ে গেছি,

গ্যালারীর মালিককে সেটা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করতে বললেন উনি নাকি চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না।

সাংবাদিক ঃ আশ্চর্য! তা আপনারা কি করবেন? মানে মন্ত্রী আসছেন যখন···।

অমিয় ঃ ডুপলিকেট্ চাবি বানিয়ে তা দিয়ে দরজা খোলাবো।

সাংবাদিক : মালিক করাবেন, না আপনারা—

অমিয় ঃ মালিককে পাচ্ছি কোথায় বলুন?

সাংবাদিক ঃ আপনাদের পক্ষে ও কাজ করা কি উচিত হবে?

অমিয় : আমার জায়গায় আপনি থাকলে কি করতেন?

সাংবাদিক ঃ প্রদর্শনীটা বন্ধ করে দিতাম। প্রেস্‌কে ডেকে সমস্যার কথাটা বলতাম।

অমিয় ঃ বন্ধ করবো! আমাদের এতদিনের প্রস্তুতি—পরিশ্রম···।

সাংবাদিক ঃ যাক, প্রসঙ্গটা আপনিই তুললেন! আসলে আমি-সেকথাই জানতে এসেছি। আচ্ছা অমিয়বাবু, দয়া করে বলবেন কি হঠাৎ এত কিছু থাকতে আপনারা উইলিয়াম কেরী নিয়ে মাতলেন কেন? দেশে কি আর কোনো ইস্যু ছিল না?

[এইখানে লেখক প্রবেশ করে, চুপচাপ কথোপকথন শুনতে থাকেন]

অমিয় ঃ আমাদের জীবনে মহাত্মা উইলিয়াম কেরীর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কিছু করায় দোষ কোথায়?

সাংবাদিক ঃ বেশতো, তাই বলে অমন যজ্ঞ করতে হবে? নাকি কেরী একজন খৃষ্টান মিশনারী ছিলেন বলেই···। মানে আমি বলতে চাইছি এর পেছনে কোন ধর্মীয় উন্মাদনা নেই তো?

লেখক ঃ বাংলা ভাষার প্রথম সাংবাদিক সম্পর্কে আর একটু সাবধানে উক্তি করাটাই বোধহয় ঠিক হবে, মাননীয় মহোদয়।

সাংবাদিক : [অমিয়কে] এ লোকটি কে মশাই?

অমিয় : ইনি? একজন ভবঘুরে।

সাংবাদিক ঃ তা এখানে কি করছে?

লেখক : আমি জবাব দিচ্ছি—তার আগে বলুন অমিয়কে যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন তা উচিত হয়নি।

সাংবাদিক ঃ আমি জানতে চেয়েছি মাত্র।

লেখক ঃ আদৌ নয়। আপনি মহাত্মা কেরীকে নিয়ে অত্যন্ত অশোভন ইঙ্গিত করেছেন।

সাংবাদিক ঃ আমি তা মনে করি না।

লেখক ঃ মনে করলে বুদ্ধি এবং বিবেচনার পরিচয় দিতেন।

অমিয় ঃ [বিরক্ত গলায়] আচ্ছা, আপনি যখন তখন এভাবে ঢুকে পড়ছেন কেন বলুন তো ?

সাংবাদিক ঃ আনঅথরাইজ্‌ড্‌ পার্সন। মানে লোকটাকে সন্দেহ করা উচিত। এখন তো দেখছি গ্যালারীর মালিক যমুনালাল দত্ত ফোনে ঠিক খবরই দিয়েছেন।

অমিয় ঃ [ব্যস্ত ভাবে] কি খবর দিয়েছেন ?

সাংবাদিক ঃ আর কিছুক্ষণের মধ্যে সবই জানতে পারবেন। ধৈর্য্য ধরুন মশাই।

লেখক ঃ বেশ তাই হবে। ততক্ষণে ঐ ধর্মীয় উন্মাদনার পয়েণ্টটা ক্লিয়ার হোক। আমাদের সাংবাদিক বন্ধু কি অস্বীকার করতে পারবেন যে আজকাল ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বমূলক সাংবাদিকতা চালু হয়েছে কোথাও কোথাও ?

সাংবাদিক ঃ আপনি অনধিকার চর্চা করছেন।

অমিয় ঃ আঃ ! ছাড়ুন তো ঐ সব কঠিন কঠিন কথা।

লেখক ঃ কেরী প্রবর্তিত দিগদর্শন ও সমাচার দর্পনের প্রায় দুশো বছর পরেও —সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা আসেনি। মাত্র কিছুকাল আগে, কয়েকটি সংবাদপত্র মিলে একটি প্রদেশে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল !

সাংবাদিক ঃ সব পেশাতেই কিছু খারাপ লোকও থাকবে।

লেখক ঃ ঠিক। কিন্তু প্রবণতাটা মানে মূল প্রবণতাটা তো থাকবে ভালো লোকের নিয়ন্ত্রণে।

সাংবাদিক ঃ তা কি নেই বলে আপনার ধারণা।

অমিয় ঃ [সমস্যা তৈরী হচ্ছে বুঝতে পেরে লেখককে] আপনি দয়া করে একটু থামবেন ? [লেখক চলে যায়]

অমিয় ঃ আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। উনি সংস্থার কেউ নয়।

সাংবাদিক ঃ তবু দিব্যি ছড়ি ঘোরাচ্ছে ! না, ব্যাপারটা সন্দেহজনক। দেখা যাক, পুলিশ এসে কি করে।

অমিয় ঃ পুলিশ।

সাংবাদিক ঃ খবর তো সেরকমই। অন্ততঃ আমি তাই জানি।

অমিয় ঃ ওঃ। আপনি কিন্তু ভুল করছেন। আরে পুলিশকে তো আসতেই হবে। মন্ত্রী আসছেন। তার আগেই এসে পজিশন নিতে হবে। অবশ্য দরজাটা খোলা সম্ভব হলেই সব কিছু ঠিকঠাক ঘটবে।

সাংবাদিক ঃ ঐ আনন্দেই থাকুন। চলি মশাই। আবার দেখা হবে। [প্রস্থান]

রূপা ঃ পুলিশ কেন অমিয়দা ?

অমিয় ঃ শুনলিতো মন্ত্রী আসছেন তাই...। দেখ এই ফাঁকে চা টা খেয়ে

আসি। সেই কখন থেকে সমানে বকে চলেছি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। [প্রস্থানোদ্যত] তুই খেয়াল রাখিস।

এই রকম সময় একজন পুলিশ অফিসার প্রবেশ করে। সঙ্গে গ্যালারীর দারোয়ান ভণ্ডুল ভদ্র।

অফিসার ঃ একদম্ চালাকি করার চেষ্টা করবেন না।

অমিয় ঃ মানে ?

অফিসার ঃ আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে। চুপ। একদম্ স্পিকটি নট্। নট নড়ন-চড়ন।

অমিয় ঃ [ভণ্ডুলকে দেখে] যাক, তাহলে চাবিটা পেয়েছো, দারোয়ানজী।

অফিসার ঃ বললাম তো, কোন রকম কায়দা না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন। [হঠাৎ এককোণে একটি বাজারের থলের মতো থলে দেখে] ওতে কি আছে ?

অমিয় ঃ আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন ?

অফিসার ঃ কারণ আমাদের কাছে তদন্তের সময় যতক্ষণ না নিরপরাধ প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ সবাই সন্দেহজনক।

অমিয় ঃ তদন্ত।

পুলিশ ঃ হ্যাঁ মশাই। কাজেই তদন্তের ব্যাপারে সহায়তা করুন। যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দিন। বলুন, ঐ থলেটাতে কি আছে ?

অমিয় ঃ ওতে ! নানা রকমের দড়ি, তাছাড়া, ছুরি, কাঁচি, একটা শাবল।

অফিসার ঃ ছুরি, কাঁচি, শাবল আবার দড়িও, চমৎকার কম্বিনেশান, এতো আস্ত একটা অস্ত্রাগার। তা ঐসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোথায় হামলা করা হবে। ফ্ল্যাট বাড়িতে, না গয়নার দোকানে—?

অমিয় ঃ আপনি কি যাতা বলছেন !

অফিসার ঃ এটাই হলো আমাদের মানে পুলিশ জীবনের ট্রাজেডি। আমরা আন্তরিক ভাবে কাজ করলেও লোকে হাসাহাসি করে, কথা বললেও গুরুত্ব দেয় না। তবু আমরা বিশেষ করে আমি নিত্যচরণ জোয়াদ্দার, কর্তব্যে কঠোর।

অমিয় ঃ আমার সব কেন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

অফিসার ঃ পুলিশ দেখলেই, যারা দুর্বলচিত্ত তাদের ঐ রকম হয় ! আহা তার জোরেই তো মশাই আমরা দাপিয়ে বেড়াই। এবারে বলুন তো —ওগুলো দিয়ে কি করবেন ?

অমিয় ঃ প্রদর্শনীর এটা ওটা কাটাকাটি করার জন্য...

অফিসার ঃ কাটাকাটি। আজকাল খুন জখম শব্দগুলো ব্যবহার করছেন না আপনারা ?

অমিয় ঃ দেখুন, আপনি অকারণে অপমানজনক কথাবার্তা বলছেন। মন্ত্রী আসার আগে পজিশান নিতে এসেছেন—দয়া করে বসুন।

অফিসার ঃ আপনারা কি আর আমাদের বসতে দিতে চান মশায়।

অমিয় ঃ রূপা, যাতো ওঁর জন্যে একটা কোল্ডড্রিংকস দিয়ে যেতে বলে আয়।

[রূপা ব্যস্তভাবে চলে যায়]

অফিসার ঃ ওসব কায়দা ছাড়ুন। তারপরই বলে বেড়াবেন—জোয়াদ্দার লোকটা ঘুষখোর। বরং কাজের কথায় আসা যাক। [সামান্য সময় চুপ করে থেকে] আপনাদের বিরুদ্ধে—মানে আপনারা যারা গতকাল একজিবিশান মেটিরিয়েল এনে এখানে ঢুকিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে।

অমিয় ঃ অভিযোগ ! !

অফিসার ঃ হ্যাঁ—খুন এবং লাশ লুকিয়ে রাখার।

অমিয় : আপনার কি মাথাখারাপ হয়েছে ?

অফিসার ঃ বেশ তো এ ব্যাপারে সাক্ষী কি বলে শোনা যাক। ভণ্ডুল সিং।

ভণ্ডুল ঃ জী মালিক।

অফিসার ঃ তুমি কাল সন্ধ্যায় যা দেখেছো নির্ভয়ে তা বলো।

ভণ্ডুল ঃ আমি তো গ্যালারীর দরজা খুলে দিয়ে কল থেকে পানি আনতে গেছি।

অফিসার ঃ ঘটনাটা বলো।

ভণ্ডুল ঃ তারপর অনেক ছবি ঢুকানো হলো। পাঁচ-ছ জন লোক কাজ করছিল, ঐ বাবুও ছিল।

অফিসার ঃ আহা থামছো কেন ! তারপর ?

ভণ্ডুল ঃ হঠাৎ টেম্পু থেকে একটা বাঁশের মাচা নামালো। দেখি কি—সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা ডেড্ বডি।

অফিসার ঃ আহা, তুমি তো তখন বললে একজন মহিলার বডি।

ভণ্ডুল ঃ হ্যাঁ, হুজুর।

অফিসার ঃ কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকা—তুমি কি করে বুঝলে যে বডিটা মহিলার ?

ভণ্ডুল ঃ আরে বুঝবো না ! বডিটার পায়ে আলতা লাগানো ছিল। তাছাড়া লম্বা চুল ঝুলছিল মাথা থেকে।

অফিসার ঃ আই সি !

ভণ্ডুল ঃ দেখে তো আমি ভয়ে কাঠ। বাবুরা তখন লাশটাকে নিয়ে হলের মধ্যে মিটিং করছে। আমি সোজা মালিককে ফোন করে দিলাম। মালিক বললো—ওরা চলে গেলে, ঘরে চাবি লাগিয়ে সোজা চাবিটা মালিককে দিয়ে আসতে।

অফিসার ঃ বাঃ ! খুব বুদ্ধি তো তোমার। [অমিয়কে] কি মশাই, এবার বলুন, ও যা বললো তা কি সত্যি ?

অমিয় ঃ [গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, ও ঠিকই দেখেছে। আমরা সত্যি সত্যি কাপড়ে ঢাকা একটি নারীমূর্তি ঘরে ঢোকাই।

অফিসার ঃ স্বীকার করলেন ! তবে আপনাদের বুদ্ধিরও তারিফ করতে হয়। দিব্যি একটা পাবলিক প্লেসে—একটা খুন করে আনা বডিকে একজিবিট্ বলে সাজিয়ে রাখলেন। দারুণ !

অমিয় ঃ দেখুন, আমি তো কবুল করেছি। এবারে ঘরটা খোলানোর ব্যবস্থা করুন। তাতে আমরাও নিশ্চিন্ত হতে পারি, আপনার অনুসন্ধানটাও করতে পারেন।

অফিসার ঃ ব্যঙ্গ করছেন ! ঠিক আছে। ভণ্ডুল সিং দরজা খোলো।

ভণ্ডুল ঃ হুজুর, আমার বহুৎ ডর করছে।

অফিসার ঃ ডর ! স্বয়ং থানার বড়বাবু উপস্থিত যেখানে সেখানে ভয় কিরে পাগলা ?

ভণ্ডুল ঃ না, যদি ভূতটুত...।

অফিসার : ইউ মিন ঘোস্ট্। তুই শুধু কোন কায়দায় একবার ব্যাটাদের ধরে দিবি। দেখবি, ওদের ভূতগিরি ঠাণ্ডা করে দেবো।

ভণ্ডুল : আপনি বললে আমি খুলে দিতে রাজী হুজুর।

অফিসার : ডরো মাত, বাচ্চু।

[ভণ্ডুল ভয়ে ভয়ে দরজা খোলে]

অফিসার : [অমিয়কে] নিন, আপনি আগে ঢুকুন।

অমিয় : আমি একা মানুষ, তাছাড়া বডিটা বেজায় ভারী।

অফিসার : তা তো হবেই, পচন ধরেছে এতক্ষণে। ভণ্ডুল, বাবুর সঙ্গে হাত লাগাও। কুইক।

ভণ্ডুল : [হাত জোড় করে] হুজুর, মাই বাপ। কিন্তু আমি ও লাশ ছুঁতে পারবো না। কোন জাতের আছে কে জানে। শেষে চাকরি করতে এসে ধর্ম নষ্ট করবো ? আরে, রাম রাম রাম [প্রস্থান]

অফিসার : আরে, ও বেটা তো পালালো দেখছি।

অমিয় : আমার পক্ষে একা ওটা তুলে আনা··· ।

অফিসার : না না, শেষে আবার কি খেল দেখাবেন। আপনি টাচ্ করবেন না মশাই। আগে আমি দেখতে চাই। চলুন।

[অফিসার এবং অমিয় সামান্য সময়ের জন্য দৃশ্যের বাইরে]

অমিয়র গলা : না, না, ওটা নয়। ঐ যেটার গায়ে মডেল নাইনটি টু লেখা। হ্যাঁ, মডেল নাইনটি টু।

পুলিশ অফিসার এবং অমিয় ধরাধরি করে, একটা বাঁশের মাচায় বাঁধা

বডির আদলের কিছু নিয়ে ফিরে আসে। সেটা রঙ্গস্থলে নামিয়ে রাখা হয়।

[ইতিমধ্যে মৌলবি, পণ্ডিত, সাংবাদিক, গানের দল সবাই একে একে এসে দাঁড়ায়।]

অফিসার : এই তো পাবলিক রয়েছে। আপনি এদের প্রত্যেকের সামনেই বডির ওপর থেকে ঢাকনাটা খুলুন।

অমিয় : [ব্যঙ্গ] একজন স্ত্রীলোকের বডিকে ওভাবে···

অফিসার : আমি নিরুপায়। সময় নষ্ট না করে চাদরখানা ওঠান।

[অমিয় এবং রূপা চাদরের দু প্রান্ত ধরে ওঠায়। চাদরটা টানটান তুলে ধরতেই তার ওপর লেখাগুলো নজরে আসে]

"মহাত্মা উইলিয়াম কেরীর অপর মহান অবদান হল, সতীদাহ প্রথা বিলোপের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। শেষ পর্যন্ত সেই কুপ্রথা আইন করে রদ করা হয়। আজ এতকাল পরেও সেই কুপ্রথা নানা চেহারা নিয়ে টিঁকে আছে। তাই সারা দেশ জুড়ে পণের দাবীতে হাজার হাজার বধূকে পুড়িয়ে মারার বিরাম নেই।"

—০—

মালদার মদনাবতী : বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উইলিয়াম কেরীর ধাত্রীভূমি

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ*

যে কতিপয় নমস্য বিদেশী এদেশের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদেরমধ্যে উইলিয়াম কেরী নিঃসন্দেহে অন্যতম। বিশেষ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যেরআদিপর্বের ইতিহাসে অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের যুগে তাঁর নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভাষার স্থপতি হিসেবে জীবনের কীর্তিবহুল ক্ষেত্রে পদচারনার আগে বর্তমান মালদা জিলার বামনগোলা থানার মদনাবতী (মদনবাটি > মদনাবাটি > মদনাবতী)-তে তাঁর কার্যকলাপ ও স্বপ্ন রচনার ইতিবৃত্তের খণ্ড খণ্ড ঘটনার উল্লেখে কেরীর অনন্য প্রতিভা, অদম্য সাহস, অসীম জ্ঞানপিপাসা এবং বাংলাভাষারপ্রতি তাঁর সুগভীর দরদী মনের পরিচয় লভ্য।

বক্ষ্যমান নিবন্ধের দুটি ভাগ ঃ—১) কেরীর মদনাবতীতে অবস্থান ও তাঁর কর্মকীর্তির প্রথমপর্বের ইতিহাস এবং ২) বর্তমানের মদনাবতীর রূপ।

১) সামান্য তন্তুবায়ের পুত্র এই কেরী, পরবর্তী পর্যায়ে জুতো সেলাইয়ের বৃত্তিগ্রহণ এবং শেষকালে অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে ধর্মযাজকের পদ গ্রহণ। এ সময়েই পত্নী ডরোথী, শ্যালিকা ক্যাথারিণ প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়াম পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে নিয়ে টমাসের সঙ্গে কলকাতায় তিনি পদার্পণ করেন ১৭৯৩ সালের ১১ই নভেম্বর। জাহাজেই টমাসের নিকট তিনি বাংলাভাষা শিক্ষা শুরু করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কেরী এর আগেই ইংরাজী ছাড়া লাতিন, গ্রীক, ডাচ, ইতালীয় ভাষা এবং ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। অদম্য জ্ঞান-পিপাসায় কেরী ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর অধ্যয়নের সীমাকে করেছিলেন সুবিস্তৃত, টমাস অবশ্য বাংলা ভাষার অনুবাদের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক। তিনি উডনীর মহীপালদীঘির নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে উডনী কেরীকে বর্তমান বরিন্দের মদনাবতীর (মদনাবাটি) নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত কবেন। ইছামতী, গঙ্গা, পদ্মা, মহানন্দা ও টাঙ্গনের নদীপথে মদনাবাটিতে কেরী সপরিবারে তাঁর মুনশী রামরাম বসু-সহ পৌঁছান ১৫ই জুন, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় দুমাস পরে তাঁর একটি চিঠিতে দেখি—"I cannot speak the language so will as to converse much, but begin a little." এবং পরের চিঠিতে জানান—"The language is very copious, and I think beautiful." এই চিঠিতেই বাংলায় প্রচলিত ভাষার দ্বিবিধ রূপের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ঐ

---

* ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ মালদা কলেজের রিডার।

বছরে তাঁর তৃতীয় পুত্র পিটার পরলোক গমন করে এবং পত্নী হন অর্ধোন্মাদ। কিন্তু এত দুর্যোগেও কেরীর স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়নি। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই বাংলাভাষায় তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। মদনাবতীতে তিনি ইউরোপীয় ধাঁচে দেশীয় কৃষকদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই পর্বে তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ মুদ্রণের পরিকল্পনাও চিন্তায় আসে। ইংলণ্ড থেকে হরফ প্রস্তুত করার চিন্তাও তিনি করেন। ইতিমধ্যে হুগলীতে চার্লস উইল্‌কিন্স্ ও পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী হরফের কথা জানেন এবং ইংলণ্ডের দশগুণ খরচ করে Book of Genesis ছাপানোর আশাও করেন।

এরই মধ্যে কেরীর ভারতীয় ভাষাগুলির মূল সংস্কৃত ভাষার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। বাংলা কথ্য ভাষার প্রতি ১০/১২ মাইলের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ভাষা বাদ দিলে নিম্নবর্ণের স্থানীয় লোকেদের ভাষা যে Jargon বা মিশ্রভাষা এবং তার মধ্যে বাংলা, হিন্দুস্থানী, ফারসী, পর্তুগীজ, আরমেনিয়ান এবং ইংরেজী শব্দও যে আছে তা লক্ষ্য করেন। এ পর্বে সংস্কৃত-বাংলার দোটানায় বিচলিত কেরী সংস্কৃত আদর্শে বাংলা ব্যাকরণ অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৭৯৫,৩১-শে ডিসেম্বর মদনাবাটি থেকে চিঠিতে জানান যে ব্যাকরণ ছাড়া মহাভারতের কিছু অংশও তিনি অনুবাদ করেছেন এবং বাংলা অভিধানও রচনা শুরু করেছেন। মহাভারত প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"Like Homer's Iliad···one of the finest production in the World."

সঙ্গী মুনশী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা কেরীর জীবনে এ সময়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ১৭৯৬ সালের জুন মাসে তিনি মুনশীকে বাধ্য হয়েই বিতাড়িত করেন এবং এরই সঙ্গে কেরীর সাধের মদনাবতীর পাঠশালাটিও বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্বে কেরীর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমেয়। এ সময়ে ফাউনটেন নামে জনৈক নূতন যুবক-প্রচারক বাংলাভাষা শিক্ষা করে কেরীর ভাষা-সাধনার সাহায্যকারী হলে ১৭৯৬ সালের মধ্যে New Testament সম্পূর্ণ অনূদিত হয়। কিন্তু ছাপানোর হিসাবে দেখা যায় যে দশহাজার কপিতে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার টাকা খরচ। তিনি ইংলণ্ড থেকে হরফ, মুদ্রণযন্ত্র এবং একজন দক্ষ মুদ্রাকরকেও পাঠানোর জন্য চিঠি দেন। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে খরচের বহর শুনে কেরী হন নিতান্ত হতদমিত ও ব্যথিত। ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে ১৭৯৭ সালে এক চিঠিতে জানান যে তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী অভিধান রচনা করে তার মধ্যে সংস্কৃত ও হিব্রুর ধাতুমূল খোঁজার চেষ্টায় আছেন।

প্রকৃত মহান কর্মবীরের জীবনেই থাকে হাজার দুর্বিপাক। কেরীর জীবনেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। মদনাবতীতে তাঁর জীবন এ পর্যায়ে হয়েছে দুর্বিষহ। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার সিদ্ধি তা হলে দূর অস্ত্। নূতন উপদ্রব

অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে তিনবছর নীলকুঠীর কাজ বন্ধ থাকায় কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সহৃদয় উডনী বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য কুঠীর কাজ আরও দু'এক বছর চালানর সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে ইংলণ্ড থেকে একটি কাঠের মুদ্রণযন্ত্র কলকাতায় নিলামে উডনী ৪০ পাউণ্ড দিয়ে কিনে তা কেরীকে উপহার দেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্রটি মদনাবতীর ঘাটে পৌঁছায়। কেরী উৎফুল্ল হয়ে হরফ আনার জন্য কলকাতায় গিয়ে ফেরার পর জানতে পারেন যে কর্তৃপক্ষ নীলকুঠী বন্ধ করার আদেশ জারি করেছেন। বিপন্ন কেরী তাঁর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে নিকটবর্তী খিদিরপুরের নীলকুঠী ক্রয় করেন। কারণ মালদার এ অংশেই তাঁর স্বপ্ন সার্থক করার তাঁর লালিত বাসনা। তাই নূতন উৎসাহে পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে জীবন শুরু করেন কেরী ও ফাউনটেন।

কিন্তু ভাগ্যদেবীর ইচ্ছা ছিল স্বতন্ত্র। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ নূতন মিশনারীরা কলকাতায় আশ্রয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ড্যানিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে আসেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করার জন্য ফাউণ্টেন ও ওয়ার্ড কেরীর পরামর্শ লাভের জন্য ১লা ডিসেম্বর মদনাবতীর কাছে বর্তমান খিদিরপুরে পৌঁছান। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কেরী তাঁর খিদিরপুরের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে মুদ্রণযন্ত্রটিকে সঙ্গে করে নৌকাযোগে মালদা (বর্তমান) পরিত্যাগ করেন মনোদুঃখে। তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর—বড়দিন। অদৃষ্ট কেরীর জীবনকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, দুঃখে, দারিদ্র্যে এবং পারিবারিক যন্ত্রণায় দগ্ধ করে হয়ত ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেছিল।

মালদার মদনাবাটি তথা মদনাবতীর পর্ব এখানেই শেষ। এর পরবর্তী পর্বে শ্রীরামপুরে এবং কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সংস্কৃত, বাংলা ও মারাঠী ভাষার অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর অনন্য সাধনা প্রতিষ্ঠিত। তাঁর 'কথোপকথন'-এ মালদার বরিন্দ এলাকার কথ্য ভাষার খাঁটি উদাহরণ। কথ্য ভাষার লিখিতরূপ বোধ করি এই প্রথম। লোকভাষাকে কেরী অনন্য মর্যাদা দিয়ে আমাদের করেছেন অধমর্ণ।

উইলিয়াম কেরীর ঘটনাবহুল জীবনে আজকের আমাদের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞার দিনে তাঁর এই ভাষাদ্বয়ের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও অনুরাগের কথা আমাদের কৃতজ্ঞ করে তোলে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় কলেজের বাংলা বিভাগ বিলোপের জন্য কর্তৃপক্ষ যে পত্র দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য জানিয়ে শেষে লিখেছিলেন "It is hoped that the unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee language will not continue." প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ্য যে মালদার চারজন স্মরণীয় বিদেশী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ-

ভাবে বাংলা গদ্যের উদ্ভবে আমাদের ঋণী করেছেন। তাঁরা হলেন—এলার্টন, জন টমাস, উইলিয়াম কেরী ও পরোক্ষভাবে উডনী।

মূলকথা, বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন উইলিয়াম কেরীর কর্মদীপ্ত ও গৌরব-বহুল জীবনের সকল স্বপ্ন ও সাধনার প্রস্তুতি এই মালদার মাটিতেই ঘটেছিল। মদনাবতীর নীলকুঠী তাঁকে অন্য সব ধর্মযাজকদের স্তরে বা সার্থক বেনিয়া করে তোলে নি—করেছিল এক মহৎ ভাষাবিদ, অনুবাদক ও সুদক্ষ সংগঠক। এ দেশীয় ভাষা বিশেষ করে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি যে কতদূর ছিল তা তাঁর সমগ্র জীবনই সাক্ষ্য দেয়। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"one of the most expressive and elegant languages of the East." তাই মালদার পরম গর্বের স্থান মদনাবাটি বা মদনাবতী, যে স্থান এক প্রাতঃস্বরণীয় ব্যক্তিকে লালিত করেছে এবং স্বপ্নদর্শনে সহায়ক হয়েছে।

২) দু-শতাব্দী পরের এখনকার মদনাবতীর দিকে এবার তাকানো যাক! প্রাচীন সে চৌহদ্দী আজ অন্তর্হিত। আজকের তার সীমা—উত্তরে দক্ষিণ দিনাজপুর, দক্ষিণে খোকসান মৌজা, পূর্বে নয়াপাড়া গ্রাম ও হাই রোড এবং পশ্চিমে টাঙ্গন নদী।

আজকের ইংরেজবাজার বা মালদা শহর থেকে উত্তরপূর্বে বামনগোলা থানার অন্তর্গত ৪৮ কিলোমিটার দূরে এই মদনাবতী গ্রাম (মৌজা—উত্তর কসবা, জে. এল. নং-৮)। হতশ্রী এই গ্রাম আজ। প্রায় ২০০ ঘর এই গ্রামে, লোকসংখ্যা প্রায় ১৭৫০, কিছু বর্ণহিন্দু, কিছু মুসলমান, পলিয়া, মাহিষ্য, নমশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও প্রায় ৫০ জন খ্রীষ্টান এ গ্রামে আছেন। শিক্ষার হার আজও ১০%, সাক্ষর ২০%। কৃষিকাজই ৯৫ ভাগ মানুষের জীবিকা। ৩% মানুষ ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত এবং চাকুরীজীবী ২%।

গ্রামের মেঘডম্বুর দীঘির পাশে (৪ একর ৪৫ শতক) আজও কেরীর ভগ্ন নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উডনীর নীলকুঠীর তত্ত্বাবধায়করূপে তিনি এখানে যোগ দেন ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন এবং ২৪শে ডিসেম্বর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে ছিলেন। এখানেই আছে তাঁর পুত্রের সমাধি।

মদনাবতীতে কেরীর নামে একটি গ্রন্থাগার করেছিলেন স্থানীয় কতিপয় উৎসাহী যুবক। কিন্তু সে গৃহের অবস্থা আজ শোচনীয়। নেই সরকারী অনুদান, নেই শিক্ষিত জনগণের দাক্ষিণ্য। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সত্যই কি কোন কর্তব্য নেই কেরীর স্মৃতিবিজড়িত এ স্থানে স্থায়ী কোন সৌধ নির্মাণ বা অন্য কিছু করা?

—০—

১৮০১—কেরী কর্তৃক সংকলিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পাঠ্যপুস্তক 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষক হিসাবে কেরীর যোগদান।

১৮০২—কেরীর উদ্যোগে সাগরে সন্তান বিসর্জন নিষিদ্ধ করে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আইন প্রণয়ন।

১৮০৬—কেরী এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন।

১৮০৭—আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে সাম্মানিক 'ডক্টর অব্ ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। প্রথমা স্ত্রী ডরোথির মৃত্যু।

১৮০৮—শার্লট রুমার নামে ডাচ মহিলাকে কেরী বিবাহ করেন।

১৮১২—কেরীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়।

১৮১৩—কোম্পানীর নতুন আইনে দেশীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ নির্ধারিত।

১৮১৬—পিতা এডমণ্ডের মৃত্যু।

১৮১৮—শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক The Friend of India সংবাদপত্র প্রকাশ।

১৮১৯ কেরী, রামমোহন ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা নিরোধক আইন প্রণয়ন।

১৮২০—কেরীর উদ্যোগে কলকাতায় Agri-Horticultural Society for India এবং মহাজনের হাত থেকে গরীবদের বাঁচাতে শ্রীরামপুরে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা।

১৮২১—কেরী রয়্যাল হর্টিকালচার সোসাইটির সদস্য হন। দ্বিতীয়া স্ত্রী শার্লট রুমারের মৃত্যু।

১৮২৩—কেরী লিনিয়ান সোসাইটি ও জিওলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো হন। তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ (বিধবা গ্রেস হিউজেসকে বিবাহ)

১৮২৭—ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের কাছ থেকে শ্রীরামপুর কলেজ ডিগ্রী প্রদান করার অধিকার পায়।

১৮৩৪—৯-ই জুন ভারতবন্ধু কেরীর জীবনাবসান।

Carey was the pioneer of the revived interest in the Vernaculars—**Rabindranath**

"তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিতজনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। একদিক হইতে আরবী ও ফার্সী এবং অন্যদিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।"

—সজনীকান্ত দাস

"Asiatic Society cannot note upon their proceedings the death of Rev. William Carey, D. D., so long an active member and ornament of this Institution distinguised alike for his high attainments in the oriental languages, for his eminent services in opening the stores of Indian Literature to the knowledge of Europe, for his extensive acquaintance with the Sciences, the natural history and botany of this Country and his useful contribution in every branch, towards the promotion of the objects of the Society without placing on record this expression of their high sense of his value and merits as a Scholar and a man of Science, their esteem for the sterling and surpassing religious and moral excellencies of his character and their sincere grief for his irrepairable loss."—কেরীর পরলোকগমনে এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রদ্ধাঞ্জলি।

"গীতায় কর্মযোগীর যে সব বিশেষণ আছে তার সবই কেরীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, কেরীকে আমি দধীচি বলে অভিহিত করতে চাই। দধীচির মত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয়।"—সজনীকান্ত দাস

"My heart is wedded to India, and though I am of little use, I felt pleasure in doing the little I can."—**William Carey**